উপনিষদ্

ও

শ্রীকৃষ্ণ

সূচনা

কিঞ্চিদধিক ষাট বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর এ জীবাধমের হাতে একখানি ছোট যুগল মূর্ত্তি দিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহার সেবা করিও।" একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা পাঠ করিও।" কথা দুইটি আজও কানে ও প্রাণে বাজিতেছে।

শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ তদবধি পাঠ করিয়াছি। বহুবার পাঠ করিয়াছি। ঐ গ্রন্থে যে সমস্ত তত্ত্ব-বিচার আছে তাহা যখন কিছুই বুঝিতাম না তখনও পাঠ করিয়াছি। পড়িতে ভাল লাগিত তাই পড়িতাম। পুনঃ পুনঃ পাঠে কিছু কিছু বোধগম্য হইতেছিল কিন্তু অধিকাংশই অবুঝা ছিল। ঐ বুঝা অবুঝার ভিতর দিয়া কলেজ জীবনে যখন পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র পড়িতাম তখন তাহার সহিত শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থোক্ত তত্ত্ব সমূহের তুলনা করিয়া আনন্দ পাইতাম। এইটুকু বুঝিতাম যে, শ্রীগ্রন্থোক্ত প্রেমতত্ত্ব ভীরু কাপুরুষ বা অলস ব্যক্তির জন্য নহে। উহা মহা-মানবের ধর্ম্ম, দেবাদিদেবের ভোগ্য।

তারপর সাংসারিক ও ব্যবহারিক জীবনে শ্রীগ্রন্থোক্ত তত্ত্বানুযায়ী জীবন গঠনে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সফলকাম হই নাই। ব্যর্থতার প্রধান কারণ এই যে, ঐ সব তত্ত্বে কার্য্যকরী দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল না। তত্ত্বালোচনা মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে পর্য্যবসিত হইত।

শ্রীচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে উপনিষদ শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে তাহার মূলগ্রন্থ পড়িবার খুব ইচ্ছা হইত কিন্তু সংস্কৃতে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকায় আশঙ্কা হইত উহা পড়িয়া বুঝিতে পারিব না। বিশেষ করিয়া, শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্বালোচনায়

উপনিষদ দ্বারা ব্রজলীলা সমর্থনে যে সকল শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা মূলগ্রন্থ হইতে পড়িতে খুব ইচ্ছা জাগিত। কিন্তু উপনিষদ দুর্ব্বোধ্য এই ধারণায় ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইত না।

মাত্র দশ বার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—আমার এই ভ্রম দূর করেন শ্রীযুত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি তখন পাবনায় জিলা জজ। পাবনায় থাকাকালীন তিনি "উপনিষদ দর্শন" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন ও আমাদিগকে পড়িয়া শোনান। কথা থাকে মূল-উপনিষদ্ পরে পড়া হইবে। তিনি ভিন্ন জিলায় বদলী হওয়ায় তাঁহার ঐ ইচ্ছা আর আমাদের সঙ্গে কার্য্যে পরিণত হয় না। উপনিষদের যে-আস্বাদন তাঁহার ঐ গ্রন্থ হইতে পাওয়া গেল তাহারই ফলস্বরূপ শঙ্করভাষ্য সহিত মূল উপনিষদ নিজে পাঠ করিবার সাহস লাভ করি। যতই পড়ি ততই উৎসাহ বাড়িতে থাকে। ক্রমে শঙ্কর ভাষ্যসহ এগারখানি উপনিষদ কয়েকবার পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত প্রেমতত্ত্ব ব্রজলীলা তত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে উপনিষদের সমর্থন পাই। এমন কি, শঙ্কর ভাষ্যও ঐ সব তত্ত্বের বিরোধী বলিয়া মনে হয় না। ক্রমে শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখোক্ত বহু মহাবাণী ও শ্রীলেখনীপ্রসূত শ্রীহরিকথাদি শ্রীগ্রন্থে উহার সুষ্ঠু সমাধান পাই। ইহাতে পূর্ব্ব কথিত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অভাব অনেকাংশে ঘুচিয়া যায়। কে যেন গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত করে। আমি যন্ত্রের মত কাজ করি। তাই নিজেকে নিজে গ্রন্থকার পরিচয় দিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থ বাংলার একটি অমূল্য রত্ন। উহাতে তত্ত্বশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সম্মিলন। সাহিত্য-রসসিক্ত শ্রুতি-স্মৃতি বেদান্তের এরূপ অপূর্ব্ব পরিবেশন বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। উহাতে বর্ণিত জীবনের যাত্রাপথে চলিলে, শুধু এদেশের নহে, সমগ্র বিশ্বের জীব পরম স্বরূপের আস্বাদন লাভ করিতে পারে। উপনিষদের ভিত্তিতে ঐ

সব তত্ত্বের আলোচনা যতই করা যায় ততই হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে, উহা ভাবপ্রবণতা মাত্র নহে। ঐ সব তত্ত্ব এই বিশ্বসৃষ্টির অতীত ভূমিতেও কার্য্য করিতেছে। তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে পারিলে মৃত্যুকে জয় করা যায়। অমৃতত্বের অধিকারী হইয়া নিত্য আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া থাকা যায়। ইহাতে আর সংসারের অবকাশ নাই।

জীবনের শেষ সীমান্তে পৌছিয়া যে সব তত্ত্বগুলিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে জীবনের প্রথম হইতে ঐ সব তত্ত্বানুযায়ী জীবন গঠিত হইলে সমাজের অশেষ কল্যাণ হইতে পারে। ছাত্রছাত্রীগণ এই গ্রন্থ পড়িয়া ঐ সব শাশ্বত তত্ত্বসিদ্ধান্তে শ্রদ্ধাবান হইয়া উহাদের অনুশীলন করতঃ জীবন গঠনে প্রয়াসী হইতেও পারে, এই আশায় সঙ্কলিত গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জাগিল।

যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করুণার দানরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর করে সমর্পণ করি। তৎপর যাহা কিছু করণীয় সে-ই করিয়াছে। গ্রন্থের সর্ব্বসত্ব তাহারই হস্তে দিয়াছি। উপসত্ব যদি কিছু হয়—তাহাও যে-জগৎকল্যাণকর কর্ম্মে শ্রীমান্ নিয়োজিত আছে তাহারই আনুকূল্যে ব্যয়িত হউক—এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছি। গ্রন্থের একটি পরিশিষ্টের কথা উপোদ্ঘাতে উল্লেখ করিয়াছি। তাহা পরে লিখিবার ইচ্ছা আছে। আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের এই সব ইচ্ছাগুলি ফলবতী হইতে পারে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছার সহিত মিলিত হইলেই। তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

বিনীত—

পাবনা　　　　　　　　　　　　　　শ্রীরণজিতচন্দ্র লাহিড়ী

আষাঢ়, ১৩৫৯

'জয় জগদ্বন্ধু হরি'

দু'টি কথা

ভারতীয় দর্শন-ভূমি বহুকাল অনাবাদী। দুইশত বৎসর ধরিয়া এই মাটিতে পরমুখাপেক্ষিতার জল সিঞ্চনে বিদেশীয় দর্শনের "কলম" জন্মাইবার চেষ্টা সার্থক হয় নাই। আজ আবার যে-মাটির যে-ফসল তাহার আবাদের দিন আসিয়াছে। তবু বাধা এখনও বহু। জনসাধারণ দার্শনিক ভাবনায় অনভ্যস্ত—অন্ন-বস্ত্র সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত। যারা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত-চিন্তাশীল, তাঁহাদের বুদ্ধি এখনও পাশ্চাত্য মোহগ্রস্ত।

একটা জাতির সমষ্টি জীবনের কথাই বল, আর একটা ব্যক্তির ব্যষ্টি জীবনের কথাই বল, বর্দ্ধমান জীবনের ভিত্তি দার্শনিকতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। একদিন ফরাসী জাগিয়াছিল রুসো ভল্টেয়ারের দর্শনে, জার্ম্মাণ জাগিয়াছিল ক্যণ্ট হেগেলের দর্শনে, আজ রাশিয়া জাগিতেছে মার্কসের দর্শনে। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চলে, কিন্তু ইহাদের চলার স্বাধীনতা নাই, ইহাদিগকে চালায় মস্তিষ্ক। সেইরূপ একটা রাষ্ট্র, একটা সমাজ, একটা পরিবার, একটা ব্যক্তি যে চলে তাহা ইহাদের চলিবার স্বাধীনতা আছে বলিয়া নহে। ইহাদের পিছনে একটা জীবনের দর্শন থাকে। কখনও জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে ঐ জীবন-দর্শনই প্রকৃত চালকের কর্ম্ম করে। যাহাদের জীবন-দর্শন নাই, তাহাদের গতিবিধি পাগলের অসম্বদ্ধ চাঞ্চল্যের সহিত তুলনীয়। দর্শন হারাইলে জাতির জীবন মরুময় হইয়া উঠে, কল্যাণের পথ সুদূর-পরাহত হইয়া পড়ে। ভারতকে জাগিতে হইলে ভারতীয় দর্শনের জাগরণ চাই-ই। হয়তো তত্ত্বজ্ঞ সাধক দার্শনিক হবেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ থাকিবে সমগ্র সমাজ।

আমরা যখন চলি তখন কেবলই চলি না, একটু থামি একটু চলি। ঘড়ির কাঁটার মত একটু চলি, একটু থামি—এইভাবে অগ্রসর হই। দার্শনিক চিন্তাও সেইরূপ সিদ্ধান্ত ও বিরোধ—এই দুই পায়ে চলে ও সমন্বয়ে একটু থামে। পরে সমন্বয়ই সিদ্ধান্তে দাঁড়ায়, নব বিরোধের উদ্বোধন হয় ও নবীন সমন্বয়ে স্থিতি হয়। দার্শনিকের এই-ই যাত্রা পথ। ভারতীয় প্রাচীন সিদ্ধান্তের সর্ব্ব-প্রথমে প্রবল শক্তিশালী বিরোধিতা আসে বৌদ্ধ দর্শন হইতে। ভারতীয় দর্শন হইতে জন্ম লইয়া সে তাহাকেই আক্রমণ করে। এই দুয়ের সংঘর্ষে উদ্ভুত নূতন দর্শনের যুগই ভারতীয় দার্শনিকতায় স্বর্ণযুগ। বিরোধী বৌদ্ধ-দর্শনকে আত্মসাৎ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর আনিলেন বিরাট সমন্বয়, অদ্বৈত-বাদের পতাকা তলে। কিছুকাল যাইতে না যাইতে সমন্বয় সিদ্ধান্তে দাঁড়াইল, ক্রমে আবার ঘরের মধ্যেই বিরোধিতা পুঞ্জিত হইতে লাগিল। পুঞ্জিত বিরোধিতা রূপ পাইল রামানুজের শ্রীভাষ্যে। আগে পাছে বহু খণ্ড-যুদ্ধ ও সন্ধি। ন্যায়ামৃত, অদ্বৈত সিদ্ধি প্রভৃতি এক একটী বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র, পাণিপথ পলাসী হইতে কোন অংশে ছোট নহে। চিন্তা রাজ্যে এই যুদ্ধ ও সন্ধিতেই প্রাণবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বহুদিন যাবত ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারার ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ ও সন্ধি নাই। তাই বলিয়াছি, জমি অনাবাদী। বিরোধী পক্ষগুলি এ ওর দিকে তাকাইতেছে, অসহনীয় উদ্বেগ লইয়া, যুদ্ধও নাই সন্ধিও নাই। আমাদের জীবন পথ দুঃখময় হইবার ইহা এক গভীরতম কারণ।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা রাজ্যে বর্ত্তমানে তিনটি প্রবল বিরোধী ধারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চাহিয়া রহিয়াছে। একটি শাঙ্করীয় মায়াবাদ,—ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা; একটি মহাপ্রভুর ভাগবতীয় জীবনবাদ,—ব্রহ্মসত্য জগৎসত্য; অপরটি পাশ্চাত্য জড়বাদ—ব্রহ্মমিথ্যা জগৎসত্য। ইহারা দাঁড়াইয়া আছে বলিয়াই মর্ম্মন্তুদ বেদনা। যুদ্ধ করিলেও ভাল হইত, সন্ধি করিলেও ভাল হইত। দার্শনিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও সন্ধির সমান মূল্য। যুদ্ধ হইলেই সন্ধি

অনিবার্য্য। সন্ধি হইলেই নূতন যুদ্ধের আয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এই যুদ্ধ ও সন্ধির মাঝেই দার্শনিকের শান্তি। যুদ্ধ, সন্ধি ও শান্তি লইয়াই জীবনের ভাবসঙ্গীতের লয় যতি সোম। ইহাই ব্রহ্মতাল বা জীবনের গতিতাল। সেই তাল কাটিয়া গিয়া প্রতিপদে বিভ্রান্তি দেখা দিতেছিল। এই "উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থখানি বিরোধিতায় সন্ধি করিয়া, সোমে আসিয়া, সমন্বয়ের সান্ত্বনা আনিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

একই প্রস্থান-ত্রয়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে শঙ্করীয় মায়াবাদ ও ভাগবতীয় জীবনবাদ। একই সরলরেখার একই বিন্দুতে দুইটি সরল রেখা দণ্ডায়মান। অথচ কোণগুলি সমকোণ হইয়া মিলিয়া যাইতেছে না—ভাবনা রাজ্যে এতদপেক্ষা বেদনাদায়ক ঘটনা আর ঘটিতে পারে না। এই গ্রন্থে সেই বেদনা নিরাকরণের চেষ্টা হইয়াছে,—পাশ্চাত্য জড়বাদের পটভূমিকা উপেক্ষা না করিয়া। উপনিষদের জ্ঞান-ভাণ্ডার দেখা হইয়াছে দ্রষ্টা শঙ্করের দৃষ্টিকোণে দাঁড়াইয়া। ভাগবতের রসভাণ্ডার আস্বাদিত হইয়াছে রসিক ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের আনুগত্য লইয়া। বস্তু-বাদ আলোচিত হইয়াছে Jeans প্রমুখ মনীষীবর্গের নব বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে। এ যেন লুক্কায়িত স্বর্গলক্ষীর সন্ধানে দেবাসুর মিলিয়া সাগর মন্থন। ফলে, গভীরতম তলদেশে যে সমন্বয়ের অমৃত-প্রবাহ তাহাই ভাসিয়া উঠিয়াছে। ইহা দৈবসম্পদে বলীয়ান। দেবতাগণের ইহা উপভোগ্য বস্তু। বিরুদ্ধবাদী যদি কেহ বলেন, অমৃত উঠে নাই। না-ই বা উঠিল। দার্শনিকের রাজ্যে ধ্যানই সমাধি, সাধনাই সিদ্ধি, চেষ্টাই কৃতিত্ব।

কেহ যদি বলেন বিষ উঠিয়াছে—অথবা, আরো মন্থন করিয়া বিষই তোলেন—তুলিলেনই বা। এ যে দার্শনিক দেবাদিদেবের ডিস্‌পেনসারী, হেথায় বিষ ও অমৃত কাঁচের আলমারীর কণ্ঠে দুই-ই সযত্নে রক্ষিত রহিবে। এই সন্ধির পরে আবার কেহ যুদ্ধের সাজে সাজুক, আবার যুদ্ধ বাঁধুক—ভারতীয় দার্শনিকতা জীবন্ত হউক, গভীরতম ভূমি হইতে ঋষি সাধনার

সত্য ফুটিয়া উঠুক, সৌরভে অলি ছুটিয়া আসুক—ইহাই তো অন্তরের সাধ।

এই গ্রন্থের মূলে ভাবনা আছে, সাধনা আছে, সর্ব্বোপরি পরমদেবতার করুণা আছে। এই ভাবনা অপরকে ভাবুক করুক। এই সাধনা অপরকে সাধক করুন। ঐ করুণার স্পর্শে সকলে সঞ্জীবিত হউক। ইহাই অন্তরের প্রার্থনা।

গ্রন্থকার নিজেকে গ্রন্থকার মনে করেন না। তিনি মনে করেন, সকলই পরম-দাতার দান—তিনি নিজে সঙ্কলয়িতা মাত্র। সঙ্কলন করিয়া তিনি গ্রন্থ আমার অযোগ্য হস্তে সমর্পণ করেন—সঙ্কলনে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া প্রকটন করিবার জন্য। আমি কিন্তু কিছুই করি নাই। উদ্যানের পুষ্প। মালী চয়ন করিয়াছে। আমি লইয়া তোড়া বাঁধিয়া বহু বাজারের বিপণিতে সাজাইয়াছি মাত্র। তোড়া বাঁধিবার তারটুকু ছাড়া আমার আর কিছু দিবার ছিল না। আমার বিশ্বাস, এই স্তবকগুলির স্তবগাঁথা কেবল স্তাবকেরা নহে, অনুভবী গায়কেরা সবাই গাহিবেন। লক্ষ পথচারীর মধ্যে দু'পাঁচটি গ্রাহক হয়তো বা যথাযথ অর্ঘ দিয়া ঠাকুর পূজায় অর্ঘ্য দিতে জীবন কুটীরে লইয়াও যাইবেন।

যাঁহারা জীবন ভরিয়া "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন" আবৃত্তি করিয়াছেন, অথচ অদ্বৈতবাদের আচার্য্য শঙ্করের নামে ভীত হইয়াছেন, তাঁহারা আজ অদ্বৈত ভিত্তিতে ব্রজদুলালকে দেখিয়া নিশ্চয়ই উৎফুল্ল হইবেন।

যাঁহারা ভগবান ও ভগবানের লীলাকে মায়োপহিত চৈতন্যের প্রকাশ জানিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের বর্ডারে স্থান দিয়াছেন—তাঁহারা আজ নিশ্চয়ই স্বয়ং ভগবান ও তাঁহার অপ্রাকৃত লীলাকে সর্ব্বতোভাবে পরম পারমার্থিকরূপে উপনিষদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানিয়া "ব্রহ্মণোহপি প্রতিষ্ঠাহং" মন্ত্রের সার্থকতানুভবনে চমৎকৃত হইবেন।

যাঁহারা প্রেমিক, হৃদয়ে যাঁহাদের প্রেম আছে, অথচ কি উপনিষদের জ্ঞানভাণ্ডারে, কি বিজ্ঞানের বস্তুভাণ্ডারে কোথাও প্রেমের নাম গন্ধ না দেখিয়া মরমে মরিয়া আছেন, তাঁহারা আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগলিত আধারে প্রেমতত্ত্ব ও প্রেমের বিগ্রহ দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই পরম সুখবোধ করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের আদর্শ মানুষটিই যে নিখিল রসের নায়ক অনন্ত জীবের জীবন দোলার মূলে যে তাঁহারি হিন্দোলা, এই তত্ত্ব উপনিষদ দ্বারে সমর্থিত ও সিদ্ধান্তিত দেখিয়া, সাহিত্য-সম্রাটের উত্তরাধিকারী রসিক সাহিত্যসেবীরা (বিশেষতঃ যারা কৃষ্ণ চরিতের আদর্শ মানুষটিকে ভালবাসিয়াছিলেন) নিশ্চয়ই আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন।

ভাবীকালের ভারতের যাহারা নাগরিক ও নেতা তাহারা যখন বিদ্যার্থী-রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউলের আড়ালে দর্শনচর্চ্চা-নিরত, তখনই যদি ভারতীয় ভাবনার, ভারতীয় সাধনার পরম চরম তত্ত্বগুলির সমন্বয়, বুদ্ধির মধ্যে অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা স্বাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক ও সুযোগ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হইবেন,—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তরণীর কর্ণধারগণও হয়তো বা সোৎসুক দৃষ্টিতে একটিবার এদিকে তাকাইয়া আশায় উজ্জ্বল চক্ষু বিস্ফারিত করিবেন।

নীরব দেবতা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর যাঁহাদের প্রাণের দেবতা তাঁহারা, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল পূর্ব্বে তাঁহারই শ্রীহস্তে উপ্ত একটি স্নেহকরুণার বীজ—"উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ" রূপে ফলপুষ্পে সুশোভিত মহা মহীরুহ আকারে বিরাজমান দেখিয়া এবং তাঁহার শ্রীকণ্ঠোক্ত একটি মহনীয় মহাবাণীর মধ্যে এত গভীর তত্ত্ব-রহস্য সংপুটিত দেখিয়া নিশ্চয়ই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবেন।

ঈদৃশ দু'পাঁচটি গ্রাহক হয়ত এ পুষ্পগুচ্ছের অনুগ্রাহক হইবেন, এই আশায় বহু বাজারের বিপুল শাস্ত্রভাণ্ডারের পার্শ্বে এ ক্ষুদ্র বিপণি খুলিলাম। পাছে, ক্ষুদ্রতায় ঢাকা পড়ে, এই ভয়ে অদ্বৈত সিদ্ধির সিদ্ধিদাতা সিদ্ধ

শ্রীমধুসূদনের সাইনবোর্ডখানি টাঙাইয়া দিলাম। একটিবার নয়ন না দিয়া কোনও পথচারী পাশ কাটাইতে পারিবেন না।

বংশী-বিভূষিত করাৎ নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণ-বিম্ব-ফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দর মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎপরং কিমপিতত্ত্বমহং ন জানে॥

বংশীকর-পীতাম্বর-বারিদ-বরণ,
বিম্বাধর-মনোহর-নলিন-নয়ন,
চন্দ্রমুখ-চিত সুখ-গোপীচিত-চোর,
কৃষ্ণ হ'তে-পর তত্ত্ব-জ্ঞাত নহে মোর।

মহাউদ্ধারণ মঠ
কলিকাতা—১১

দীনহীন
মহানামব্রত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

উপোদ্ঘাত (পৃষ্ঠা ১—১৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেমতত্ত্ব (পৃষ্ঠা ১৫—৪৪)

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রজলীলা (পৃষ্ঠা ৪৪—১৭২)

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রজলীলায় জীবের স্থান (পৃষ্ঠা ১৭৩—২১৪)

স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি জীবশক্তি। জীবের স্বাধীনতা—করুণায় অভিব্যক্তি। মায়াশক্তি—চিৎশক্তিআবৃত। চিৎ হইতে পৃথক বোধই মায়া। সনাতন শিক্ষা—লীলায় প্রবেশদ্বার। শ্রীরূপানুগ্রহ—কল্পবৃক্ষ জগন্নাথ। নৈতিক জীবন—ইষ্টরতি। ব্যষ্টি-সমষ্টি। রাগাত্মিকা-রাগানুগা। জীবাত্মা-পরমাত্মা। কেনোপনিষদে যক্ষ। বিদিত অবিদিত—জীবমায়া সোঽহং—তত্ত্বমসি—ব্রহ্ম ও জীবন। সত্যাশ্রয় মায়াত্যাগ—দুই পাখী। শ্রেয় প্রেয়ঃ—আত্মন্তরী সর্ব্বন্তরী। মুখ্যপ্রাণ—পঞ্চপ্রাণ—জীবমায়া। সনৎকুমার নারদ—প্রাণতত্ত্ব অতিবাদী সত্যাশ্রয়া রাগানুগা। আত্মরতি আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন আত্মানন্দ। পঞ্চরসের সাধন। নামকীর্ত্তন—শিক্ষা শ্লোক। নামরস—মহাপ্রভুর নাম বিরহ—প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের নাম বিরহ। দেবগণে মৃত্যুঞ্জয়। প্রণব নামে যুগলমিলন। উপনিষদে নামাশ্রয়ের ইঙ্গিত। অক্ষর উপাসনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি, ব্রহ্ম হরিদাস-নামে মায়া উদ্ধার।

উপসংহার—অখণ্ড দর্শন। (পৃষ্ঠা ২১৫ – ২২০)

উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ

প্রথম অধ্যায়

উপোদ্ঘাত

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীকণ্ঠোক্ত ও শ্রীলেখনী-প্রসূত বহু মঙ্গলময় বাণী আছে। তাঁহার বাণীসমূহ অধিকাংশই সূত্রাকার।—"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ গূঢ়-নির্ণয়ম্।" তাহারই একটি বাণী অবলম্বনে এই গ্রন্থ। বাণীটি এই ;—

অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি সংসারের অধীশ্বর ও অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যক বিরাট তুরীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ধ্যেয়-বস্তু শ্রীকৃষ্ণ—নিরুপাধি মাধুর্য্য-বিগ্রহ।

ইহা বাণী নহে—মহাবাণী। ইহাতে সমগ্র শ্রুতির নির্য্যাস, পরম মধুর ও পরম গভীর তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। ইহার প্রতিপাদ্য বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ।

এই বাণীতে "অধীশ্বর" "ধ্যেয় বস্তু" ও "মাধুর্য্য-বিগ্রহ," এই তিনটী শব্দ পর পর, প্রকৃতি, চিদ্‌বস্তু ও মাধুর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছে। যাহাকে জগৎ বা সংসার বলা হয়, তাহা প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণকে তাহার অধীশ্বর বলা হইয়াছে। যে শক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি করিয়া জগৎ সংরক্ষণ ও কালে ধ্বংস করিতেছেন, তাহা তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা মায়া-শক্তির

প্রকাশ। সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে এই শক্তির বিষয় আলোচনা হইতেছে।

ইহার পর সৃষ্টিতে প্রকাশিত চিৎশক্তি, যাহা জীবের মধ্যে কণারূপে আছে, তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ ধ্যাতা ও ধ্যেয় বলা হইয়াছে।

এই চিৎশক্তি মানুষের অনুভবগম্য। দর্শন শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ও ধর্ম্ম আদি বিষয় যে যে মনোবৃত্তির উপর স্থাপিত, তাহা সমস্তই এই চিৎশক্তির বহিঃপ্রকাশ।

ইহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ "ধ্যেয়" বলায়, শ্রীকৃষ্ণই ইহার আদর্শ ইহা বুঝা যায়। যাহাকে যে ধ্যান করে, সে তাহার আদর্শ। চিৎশক্তির লক্ষ্যই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলনে চিদ্‌বস্তুর সার্থকতা। পরিশেষে ঐ বাণীতে বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং "নিরুপাধি মাধুর্য্য-বিগ্রহ"। প্রকৃতি ও চিদ্‌বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ উপাধিযুক্ত অর্থাৎ ঐ প্রকাশে মূল তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অভিব্যক্তির মধ্যে উপাধি নামক তৃতীয় বস্তু আছে। যেমন অগ্নি ও তাহার প্রকাশ—উষ্ণতা ও জ্যোতিঃ, ইহা ইন্ধন-সাপেক্ষ। ইন্ধন না থাকিলে অগ্নির উষ্ণতা ও জ্যোতিঃ প্রকাশ হয় না। প্রাকৃত সমস্ত শক্তির প্রকাশই উপাধি (medium) সাপেক্ষ। সৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রকার চিৎশক্তির প্রকাশ, প্রাণবন্ত ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত, স্থান ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ, দেহ-সাপেক্ষ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এইরূপ কোন উপাধি-সাপেক্ষ নহে। তাঁহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয় আদি

সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য, ঘনীভূত প্রকট মাধুর্য্যরূপে আস্বাদ্য ও ভজনীয়। তিনি কেবলই মাধুর্য্য এবং ঐ মাধুর্য্য ঘনীভূতরূপে বিগ্রহ আকার হইয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চুয়ান্ন শ্লোকে উল্লেখ আছে, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈক রসমূর্ত্তয়ঃ" দেখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর ঐ বাণীকে ব্রজলীলা-তত্ত্বের সার বলা যায়। এই পরম-তত্ত্ব-জ্ঞাপক মহাবাণী—উপনিষদ্ দ্বারা সমর্থন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

২। ব্রজলীলা তত্ত্বের প্রেম-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধা-তত্ত্ব, গোপী-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব ইত্যাদি শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোস্বামী বিরচিত প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নানাস্থানে বিশেষতঃ আদি-লীলা দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অধ্যায়ে, মধ্য-লীলা অষ্টম, নবম, এবং উনবিংশ হইতে চতুর্বিংশ অধ্যায়ে আছে। ইহা শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী কৃত ষট্-সন্দর্ভ সার বলিয়া মনে হয়। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শ্রীপ্রকাশান[illegible] সহিত কাশীধামে, এবং শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের [illegible] বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক উপনিষদ্ দ্বারা [illegible] করার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে, আ[illegible] মধ্য-লীলা ষষ্ঠ, সপ্তদশ ও পঞ্চবিংশ [illegible] উহার ভাষা যতদূর সম্ভব বজায় র[illegible] যাইতেছে।

"ব্রহ্ম শব্দের অর্থ চিদৈশ্বর্য্য [illegible]
তাঁহার বিভূতি, দেহ ইত[illegible]

তিনি স্বয়ংসিদ্ধ ও তাঁহার স্থান ও পরিবার চিদানন্দ। ভগবন্মূর্ত্তি বা তাঁহার স্থান, পরিবার, গুণ ও শক্তি, প্রাকৃত নহে। ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্বলিত জ্বলন—জীব-তত্ত্ব স্ফুলিঙ্গের কণ। "জীব-তত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণ-তত্ত্ব—শক্তিমান্।"
কৃষ্ণ মায়াধীশ—জীব মায়া-বশ। হেন জীব কখনও পরতত্ত্ব হইতে পারে না। "অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥ তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যের হয় অধিকারী।" ভগবানের জগদ্রূপে পরিণাম বিবর্ত্ত বা ভ্রম নহে। জীব দেহে আত্ম-বুদ্ধিই প্রকৃত ভ্রম। প্রণব ঐ বেদের মহাবাক্য এবং বেদের নিদান। "ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম। সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ্য।" বৃহদ্ বস্তু ভগবান্ ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম। "স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ। সকল বেদে কহে ভগবান্ সম্বন্ধ॥" তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন। শ্রুতিগণ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ কহেন, তাহা প্রাকৃত নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত স্থাপন। "ভগবান্ বহু হইতে যবে কৈল মন। প্রাকৃত শক্তিতে কৈল বিলোকন॥ সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন ও নয়ন। অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্ম নেত্র মন॥ অপাণিপাদ শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ। পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ॥ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুই'ত সমান। নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দ-স্বরূপ॥ দেহ-দেহী, নাম-নামী, কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্ম, নাম, স্বরূপ বিভেদ॥ অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে

হয় স্বপ্রকাশ॥ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গুণ কৃষ্ণ লীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥ ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলা রস। ব্রহ্ম-জ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্ম-বশ॥"

৩। এই বর্ণনায় উপনিষদের ধ্বনি স্পষ্ট শুনা যায়। জাগতিক ও ভাগবতীয় বৈশিষ্টের পার্থক্য প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদের উপরে স্থাপিত। এই ভেদ ভিন্ন ভিন্ন শব্দে সমস্ত উপনিষদে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রজলীলায় যে সমস্ত রূপ, কার্য্য ও ভাব বর্ণিত আছে, তাহা সমস্তই আদর্শ স্থানীয় (Ideal) অর্থাৎ অপ্রাকৃত। অদ্বয় প্রেম-তত্ত্ব ব্রজলীলায় শক্তি ও শক্তিমান্ ভেদে রস বিস্তার করিতেছে। তাহার ফলেই স্থান ও কালের সীমায় সমস্তই রসময় হইতেছে। ব্রজলীলার পটভূমিতে জাগতিক সমস্ত ব্যাপার দেখিতে পারিলে সমস্তই আনন্দময় হয়। ব্রজলীলার একদিকে যেমন "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন" অন্যদিকে "মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম। তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥ স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥" আধুনিক বিজ্ঞানে বহু ও নানার মধ্যে এক শৃঙ্খলা (System) থাকা স্বীকৃত। উহার প্রকার ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে। এই শৃঙ্খলার ভিত্তি প্রেম-তত্ত্ব। স্বয়ং ভগবান্ প্রেমরূপী শৃঙ্খলার অধীন। তিনি প্রেমাধীন।

"অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেম রস আস্বাদন॥"
"কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর-জঙ্গম।
কৃষ্ণ প্রেমে নৃত্য করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥"

"কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়।
আপনে নাচায়—তিনে নাচে এক ঠাঁয়॥"

এই শৃঙ্খলারূপী প্রেম-তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব (Personality) অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধযুক্ত। মাধুর্য্যাত্মক যে শৃঙ্খলা সৃষ্টিতে বর্ত্তমান, তাহারই ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণের সমস্তই মাধুর্য্যময়। তবে পার্থক্য এই যে, সৃষ্টিতে মাধুর্য্যের প্রকাশ উপাধি-সাপেক্ষ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে, তিনি স্বয়ংই উপাধি। মাধুর্য্য ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের অন্য উপাধি নাই। উপনিষদ্ দ্বারা এই সমস্ত বিষয় এই গ্রন্থে সমর্থন করা হইবে।

৪। যে কয়খানি উপনিষদের মন্ত্র-দ্বারা ব্রজলীলা সমর্থন করা হইবে, তাহার প্রত্যেকখানির শাঙ্করভাষ্য আছে। ঐ উপনিষদ্‌গুলি হইতেছে—

১। বৃহদারণ্যক, ২। ছান্দোগ্য, ৩। তৈত্তিরীয়, ৪। শ্বেতাশ্বতর, ৫। প্রশ্ন, ৬। ঈশ, ৭। কেন, ৮। কঠ, ৯। মুণ্ড, ১০। মাণ্ডুক্য, ১১। ঐতরেয়। ইহা ব্যতীত আরও অনেক উপনিষদ্ আছে। উহার মোট সংখ্যা মুক্তিক উপনিষদে ও শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপনিষদ্ দর্শন' নামক গ্রন্থে একশত বারো খানা বলিয়া উল্লেখ আছে। এই সমস্ত উপনিষদের কতক যে বৈদিক যুগের, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পৌরাণিক যুগেও, এমন কি তাহার পরেও, অনেক উপনিষদ্ রচিত বলিয়া মনে হয়। কখন কি প্রকারে বর্ত্তমান আকারে উপনিষদ্‌গুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নির্ণয়ের কোন চেষ্টা করার আমাদের প্রয়োজন নাই। বোধ হয় তাহা দুঃসাধ্যও। যে

উপনিষদ্‌গুলির শাঙ্করভাষ্য আছে,—শঙ্করাচার্য্য যেগুলি হইতে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই সাধারণতঃ মৌলিক উপনিষদ্ বলিয়া বিবেচিত হয়। মহামহোপাধ্যায় ৺দুর্গাচরণ সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত উপনিষদের সংস্করণে মূলমন্ত্রের ও শাঙ্করভাষ্যের শব্দগত অর্থ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে। ঐ সংস্করণে মূলমন্ত্রের ও শাঙ্করভাষ্যের যে অর্থ দেওয়া আছে, আমরা তাহাই ব্যবহার করিয়াছি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম্ এ, বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয়ের এবং শ্রীমদ্ভাগবতের, ৺রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের, ব্যাখ্যা-সহ সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছি।

৫। বেদব্যাস বিরচিত ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ আছে। ইহা ব্যতীত সাংখ্য-বেদান্ত আদি নানা দর্শন শাস্ত্র আছে। এই সমস্ত গ্রন্থ মূল উপনিষদের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক এই সমস্ত গ্রন্থের বহু ভাষ্য আছে। এই সমস্ত ভাষ্যে গুরুতর মতভেদ আছে বলিয়া প্রকাশ। শঙ্করের মায়াবাদ, অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, একটী প্রধান মত বলিয়া প্রচলিত আছে। অন্যান্য মতবাদের—বিশেষতঃ যে সমস্ত মতবাদে ভগবদ্-লীলা সমর্থিত হয়, তাহার সহিত শঙ্করের মতবাদের ঘোর অনৈক্য আছে বলিয়া অনেকের ধারণা। পূর্ব্ব বর্ণিত এগারখানি উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া ব্রজলীলাতত্ত্বের ও শঙ্করবাদের মূলতঃ যে অনৈক্য নাই, তাহা প্রদর্শিত হইবে। তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এখানে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না।

৬। শঙ্করের মায়াবাদে সৃষ্টি ও সৃষ্টিতে যে বহু এবং নানা দেশ ও কাল দৃষ্ট হয়, তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব ভিন্ন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, বলা হইয়াছে। ঐ ব্যবহারিক অস্তিত্ব অজ্ঞান প্রসূত এবং এই অজ্ঞান মায়াজনিত। জ্ঞান হইলে বহু ও নানার অস্তিত্ব থাকে না। দেশ ও কাল থাকে না। রজ্জুতে সর্প ভ্রম যেমন আলোকে দূর হয়, তেমনি জ্ঞানালোকে জগতের নানাত্ব লোপ হইয়া, ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য এবং জীব ও ব্রহ্মে কোন-ভেদ-না-থাকা উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় কোনও দেব দেবী, বা অবতার, কি লীলা, অথবা সৃষ্টি ও জীবের সহিত উহাদের কোন স্রষ্টা-সৃষ্ট বা সেব্য-সেবক ইত্যাদি সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং এই সমস্ত বহু ও নানা, ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য বস্তু হইতে পারে না। জ্ঞান হইলেই ইহার ধ্বংস হয়। সাধন-ভজন কেবল জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য। জ্ঞান হইলেই আর তার প্রয়োজন নাই। ইহা নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা। ঐ অবস্থায় ব্রহ্ম-ভিন্ন আর কিছুরই সত্তা থাকে না। মোটামুটি ভাবে ইহাই শঙ্করবাদ। ইহাতে একত্বের সর্ব্বোপরি স্থান। বহু ও নানা অনিত্য বলিয়া তাহার পারমার্থিক সত্তা অস্বীকৃত হইয়াছে। ব্রজলীলা তত্ত্বে নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা অস্বীকৃত নহে। এই অবস্থাকে ব্রজলীলায় আত্মারামের শান্তভাব বলা হইয়াছে। এই ভাবের পরেও ব্রজলীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কেবল মাধুর্য্য-আস্বাদনাত্মক অবস্থা বর্ণিত আছে।

"ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-যুক্ত, কেবলা-ভাব আর।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার॥" চৈঃ চঃ ৩/৭/২৩।

এই মাধুর্য্য-আস্বাদনাত্মক অবস্থা জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের আদর্শ। ইহা উপনিষদ্ দ্বারা সমর্থিত হইবে।

৭। ব্রহ্ম যে এক ও অদ্বিতীয় তাহা সমস্ত উপনিষদে স্বীকৃত। এই একত্বের রকম নানাপ্রকার। আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানে নানারকম একত্ব লক্ষিত হয়। সংখ্যা-বাচক একত্বের পৃথক বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মকে কখনও সংখ্যা-বাচক এক, বলা যায় না; কারণ ব্রহ্ম এক বলিলেই তাহার দ্বিতীয় বা বহু থাকা বুঝায়। সংখ্যা হিসাবে ব্রহ্মকে এক, দুই বা বহু কিছুই বলা চলে না। আবার সবই বলা চলে। যান্ত্রিক একত্ব, রাসায়নিক একত্ব, জৈবিক একত্ব, চৈতন্যের একত্ব ইত্যাদি যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের একত্ব বাস্তব জগতে আমরা দেখিতে পাই, তাহার মূল লক্ষ্য, বহুকে এক শৃঙ্খলা দ্বারা বদ্ধ করা। যান্ত্রিক একত্বে যন্ত্রের বহু অংশ একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক একত্বে ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থ স্বতন্ত্র একটী পদার্থ সৃষ্টি করে। জৈবিক একত্বে প্রাণবন্ত দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়া, পরস্পর পরস্পরকে শক্তিমান্ করিয়া একই প্রাণ-প্রবাহ রক্ষা করে। সর্ব্বোপরি চৈতন্যের একত্ব, ভিন্ন ভিন্ন মানসিক বৃত্তিকে আত্ম-চৈতন্যের ভিতর দিয়া, প্রকাশিত করে। এই আত্ম-চৈতন্যই চিৎশক্তি। ইহা ভেদ হইয়াও অভেদ এবং অভেদ হইয়াও ভেদ। আপাত দৃষ্টিতে যতপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, তাহা সমস্তই এই চিৎশক্তিতে সামঞ্জস্য পাইতেছে।

৮। শঙ্কর, ব্রহ্মের একত্ব যে জৈবিক ও চিৎশক্তির একত্ব

অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত উপনিষদের মন্ত্রগুলির ভাষ্যে পরিষ্কার রূপে পাওয়া যায় :—

(ক) তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তম অনুবাকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—

"এইরূপ একই উদ্দেশ্যে জড়বর্গের সংহনন বা সম্মিলিতভাবে কার্য্য, তাহা কখনই কোন অসংহত চেতন পদার্থের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। এই অসংহত চেতন পদার্থের স্বরূপ আনন্দ। যদি হৃদয়-আকাশে এই আনন্দ নিহিত না থাকিত, কেহই প্রাণাপান ব্যাপার করিতে পারিত না। অতএব নিশ্চয়ই ব্রহ্ম আছেন,—যাহার জন্য এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির কার্য্য হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বারাই লোকের আনন্দ সম্পন্ন হয়।"

(খ) ঐ উপনিষদের ঐ বল্লীর অষ্টম অনুবাকে পূর্ণ একটী মানুষের আনন্দকে একক ধরিয়া তাহার পুনঃ পুনঃ শতগুণ করতঃ ব্রহ্মের আনন্দের পরিমাণ করার চেষ্টা হইয়াছে। শঙ্কর ইহার ভাষ্য করিয়াছেন—

"বস্তুতঃ লোকসিদ্ধ এই আনন্দ দ্বারা বিষয়-ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নির্ব্বিষয়ক বুদ্ধিমাত্রগম্য আনন্দকে বুঝা যাইতে পারে। কেননা লৌকিক আনন্দ ব্রহ্মানন্দেরই অংশ।"

(গ) বৃহদারণ্যকে উপনিষদের প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ষষ্ঠ মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—

"উপাধি-বিশেষের সম্বন্ধ-নিবন্ধন এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে, যাহাতে সংসারিত্ব ও অসংসারিত্ব উভয় কল্পনারই ব্যাঘাত

না ঘটে। অন্য উপনিষদে আছে, 'যিনি একস্থানে অবস্থিত হইয়াও দূরে গমন করেন, শয়ন থাকিয়াও সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন, মদযুক্ত ও মদ-বিযুক্ত সেই দেবকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে'। এই সমস্ত শ্রুতিতে জানা যায় যে সংসারিত্ব ধর্ম্মটা সোপাধিক, পারমার্থিক নহে। এই প্রকার উপাধি-সম্বন্ধ নিবন্ধন হিরণ্যগর্ভের একত্ব ও নানাত্ব দুইই সম্ভব হয়। হিরণ্যগর্ভের উপাধি স্বতঃই বিশুদ্ধ। পক্ষান্তরে, জীবগণের উপাধি স্বভাবতঃই অশুদ্ধি-বহুল।

(ঘ) ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ডে দেবাসুর যুদ্ধে উদ্গীথ ভক্তির উপাসনা বর্ণিত আছে। তাহার শাঙ্করভাষ্যে পাওয়া যায়—

"যে হেতু প্রাণাদি করণবর্গ নিজ নিজ কল্যাণ লাভে আসক্ত, এই কারণে তাহারা আত্মম্ভরি অর্থাৎ নিজ নিজ পোষণে রত। মুখ্য প্রাণ আত্মম্ভরি নহে, পরন্তু সকলের পরিপোষণে রত। অতএব মুখ্য প্রাণ সর্ব্বম্ভরি। উদ্গীথ ভক্তি দ্বারা মুখ্য প্রাণকে উপাসনা করিয়া দেবতাগণ অসুরগণকে পরাভব করিয়াছিলেন।"

৯। এ সমস্ত মন্ত্র ও তাহার শঙ্করভাষ্যের বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। এ স্থানে উল্লেখের উদ্দেশ্য, 'বহু ও নানা হইয়া ব্রহ্ম এক' যে শঙ্কর বলিয়াছেন, তাহাই দেখান। ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিয়া বহু ও নানাকে দেখাকেই শঙ্কর মায়া বা অজ্ঞান বলিয়াছেন। বহু ও নানা, ব্রহ্মতেই দেখিতে হইবে এবং তাহার ভিতর দিয়াই ব্রহ্মকে উপলব্ধি

করিতে হইবে। অদ্বৈত ও দ্বৈত মতের এই সামঞ্জস্য অন্যান্য বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট বিষয়ে, যথা—নিরাকার—সাকার, নির্গুণ—সগুণ, অনন্ত—সান্ত, অসীম—সসীম ইত্যাদিতেও, উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যে পাওয়া যায়। বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট বিষয়গুলির এক অংশের উপর অধিক গুরুত্ব স্থাপন করাতেই মতভেদ উপস্থিত হয়।

১০। ভাষাও মতভেদের অন্যতম কারণ—ভাষা খণ্ড-জ্ঞান মূলক, মূল তত্ত্ব অখণ্ড বা ভূমা। মানুষের বিষয়েন্দ্রিয় যোগে যে মনোভাব হয়, ভাষা তাহাই প্রকাশের চেষ্টা করে। বিষয়েন্দ্রিয় যোগ দেশ ও কাল সাপেক্ষ। সেইজন্য ঐ যোগের প্রকাশক ভাষাও দেশ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং খণ্ড। দেশ ও কালের অতীত তত্ত্বকে ভাষার দ্বারা প্রকাশের চেষ্টাই নানারূপ মতভেদ সৃষ্টি করে। গভীর ভাবে উপলব্ধি করিলে, বাস্তবিক উদ্দেশ্য সকলেরই যে এক, তাহা বুঝা যায়। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মত অসাম্প্রদায়িকভাবে বিবেচনা করিলে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। জ্ঞান-তত্ত্ব ও প্রেম-তত্ত্বের ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও মূলে কোন পার্থক্য নাই। জ্ঞানের চরম পরিণতি প্রেম। ইহা উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের মাধুর্য্যময় আনন্দ-তত্ত্ব হইতে বুঝা যায়।

১১। উপনিষদের ভাষ্য ছাড়াও আচার্য্য শঙ্কর শ্রীমদ্ভগবদগীতা ব্রহ্মসূত্র ও অন্যান্য গ্রন্থের ভাষ্য করিয়াছেন। সমস্তের মূল উপনিষদ্। উহার শাঙ্কর-ভাষ্যেরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত

বিবেচনায় অন্যান্য গ্রন্থের ভাষ্যের উল্লেখ করা হয় নাই। ব্রহ্ম-সূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, এই তিন গ্রন্থই বেদব্যাস বিরচিত। সেই জন্যে এই তিন গ্রন্থের বর্ণিত তত্ত্বে মূলতঃ কোন ভেদ থাকিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে যে সমস্ত তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহার অনেক স্থানে উপনিষদের মন্ত্রের ধ্বনি সুস্পষ্ট শুনা যায়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় উপনিষদের অনেক মন্ত্র উল্লিখিত আছে। ব্রহ্ম-সূত্র উপনিষদেরই সার সমন্বয়। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "উপনিষদ্ দর্শন" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"ঋষি বেদব্যাস যখন ব্রহ্ম-সূত্র রচনা করেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, উপনিষদের যে চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত আকারে নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া একটী সমগ্ররূপ দান করা"। উপনিষদ্, ব্রহ্ম-সূত্র, শ্রীমদ্-ভাগবত ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার সামঞ্জস্য বাঙ্গালার পণ্ডিত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্রহ্ম-সূত্রের গোবিন্দ ভাষ্যে পাওয়া যায়। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ-গুলিতে উহা আলোচিত হইয়াছে। উপনিষদ্ পড়িয়া শ্রীমদ্-ভাগবতের বর্ণিত ব্রজলীলা আস্বাদন করিলে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যে মাধুর্য্য উপনিষদে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া থাকার কথা বর্ণিত আছে, সেই মাধুর্য্যই ব্রজলীলায় মূর্ত্ত ও আস্বাদ্য হইয়াছে। উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রজলীলায় "আনন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ" হইয়াছে। এই সমস্ত কথা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের উপরোক্ত মহাবাণীটির মধ্যে প্রকট হইয়াছে। ইহাই দেখান এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

১২। এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে প্রেম-তত্ত্ব, লীলা-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। লীলা-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্ব অখণ্ড প্রেম-তত্ত্বেরই অন্তর্গত। প্রেম-তত্ত্বে রস আস্বাদন ও রস বিস্তার জন্য শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ হয়। শক্তি স্বরূপ-শক্তি, মায়া-শক্তি ও জীব-শক্তি নামে, তিন রূপে প্রকাশ। স্বরূপ-শক্তির সহিত শক্তিমানের যে সম্বন্ধ, তাহাই নিত্যলীলা। মায়া-শক্তি ও জীব-শক্তি ঐ নিত্যলীলা-সৃষ্টিতে প্রকট হইয়া কারুণ্যের রস বিস্তার করে। জীব-শক্তি স্বরূপ ও মায়া-শক্তির মধ্যবর্ত্তী শক্তি। জীব কখনও মায়া-শক্তির প্রভাবে বহির্মুখ হয় এবং কখনও স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে অন্তর্মুখ হয়। জীবের ইহাই স্বাধীনতা। জীবের বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ বৃত্তিকে ভগবৎ-কারুণ্যে সামঞ্জস্য করা ব্রজলীলার একটি উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ব্যতীত অন্যান্য পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার উল্লেখ এবং অন্যান্য ধর্ম্মমতের সহিত ব্রজলীলা তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করা হইবে।

১৩। মাত্র বিচার বুদ্ধি দ্বারা ব্রজলীলার আস্বাদন পাওয়া যায় না। প্রাকৃত মনের যুক্তি-তর্কে ঐ লীলায় বিশ্বাস জন্মান যায় না। লীলা-তত্ত্ব স্বপ্রকাশ। জীবমাত্রেই ঐ তত্ত্ব নিভৃত ও নিগূঢ় অবস্থায় আছে। ঈশোপনিষদের ভাষায়—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥" ১৫

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

সাধু-সঙ্গে পুনঃ পুনঃ লীলা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। তত্ত্ব-বিচার বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়া চিত্ত-শুদ্ধির সাহায্য করে। এই গ্রন্থ পাঠে যদি তাহার কিঞ্চিৎ মাত্রও আনুকূল্য হয়, তবে চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেম-তত্ত্ব

১। মানবজাতি সৃষ্টির সর্ব্বশেষে আসিলেও সৃষ্টির আদি ও তাহার মূলতত্ত্ব জানিতে সর্ব্বদাই ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার ফলেই দর্শন, বিজ্ঞানাদি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার উৎপত্তি। কেন ও কি প্রকারে সৃষ্টি হইল, আদি বৈদিককাল হইতেই মানুষের তাহা জানিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। প্রত্যেক উপনিষদেই সৃষ্টির আদি ও প্রকার বর্ণিত আছে। ঐ বর্ণনায় পাই, ব্রহ্মের কামনা সৃষ্টির মূল। ব্রহ্মের এই কামনার লক্ষ্য মাধুর্য্যরস আস্বাদন ও বিস্তার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি পয়ারে ঠিক এই কথাই আছে :—

"প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্‌গম॥ ১।৪।১৪।১৫

উক্ত পয়ারে উল্লিখিত ভগবদিচ্ছা ও উপনিষদের বর্ণিত

ব্রহ্মের কামনা (ঈক্ষণ) একই বস্তু। ভগবদিচ্ছার হেতু বলা হইয়াছে—প্রেম-রসের নির্য্যাস আস্বাদন করা। শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর, এই জন্য প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদনের ইচ্ছা হয়। অপর হেতু—রাগমার্গে ভক্তি, লোকে প্রচার করা। শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণ, তাই তিনি নিজে রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হন না; ঐ রস প্রাকৃত-জগতের লোককে আস্বাদন করাইতে চান। এই জন্যই তিনি "রসিক শেখর" ও "পরম-করুণ"। প্রেম-তত্ত্ব ব্রহ্মের এই রস ও কারুণ্য। রসে আস্বাদন, আস্বাদ্য ও আস্বাদক—তিনই বর্ত্তমান। এই তিনের সমষ্টিই রস। কারুণ্য, রসেরই একটি ফল। রসিক যেমন স্বয়ং রস আস্বাদন করেন, তেমনি নিজেকে বিস্তার করিয়া রসের চমৎকারিত্ব উৎপাদন করেন। রসের এই বিস্তারই কারুণ্য। রস আস্বাদিত ও বিস্তারিত হওয়ার জন্যই ভেদ। মূল ও আদি ভেদ দ্বৈতে—যথা:—শক্তি-শক্তিমান্, আশ্রয়-বিষয়, ভোক্তা-ভোগ্য, আস্বাদক-আস্বাদ্য, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ইত্যাদি। মূল এই দ্বৈতভেদ হইতেই অনন্ত ভেদ হয়। অনন্ত ভেদ হইতে অনন্ত প্রকার রসের উৎপত্তি হয়। অনন্ত রসের আস্বাদও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়।

২। লৌকিক ভাবে রস আস্বাদনের প্রথম বিভাগ সুখ ও দুঃখ। জগতের বহু ও নানার কতক সুখাত্মক, কতক দুঃখাত্মক। ইহাতে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে যে, দুঃখাত্মক বহু ও নানা—তাহা কি প্রকারে পরম করুণ ভগবদিচ্ছায় হইতে পারে? মৃত্যুই দুঃখের চরম অবস্থা। এই মৃত্যু ভয়ই সর্ব্বপ্রকার দুঃখানুভূতির মূল। এই মৃত্যুভয় সমগ্র-দৃষ্টির (অর্থাৎ জ্ঞানের) অভাব জনিত।

বিষয়-ইন্দ্রিয়-যোগে যে দুঃখাত্মক অনুভূতি হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে—

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥" ২।১৪

বিষয়-ইন্দ্রিয়-যোগে যে শারীরিক কষ্ট হয়, তাহা চেষ্টা দ্বারা জয় করা যায়, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখি। যে প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে এই সমস্ত শারীরিক কষ্ট হয়, ঐ সমস্ত নিয়মেই যে সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। যে মৃত্যু ভয়ে আমরা সর্ব্বদাই ভীত, এই মৃত্যু প্রলয়েরই এক প্রকার। এই প্রলয়, সৃষ্টি ও স্থিতির ন্যায়, মহাকালেরই এক দিক। ধ্বংস না হইলে সুধু সৃষ্টি ও স্থিতি সম্ভব নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" বলিয়া যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা লোকক্ষয়কারী মহাকালের রূপ। এই জ্ঞান হইলেই মৃত্যু ভয় দূর হইয়া অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়। সমস্ত উপনিষদের ইহাই প্রধান শিক্ষা। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা—ভূমিকম্প, দাবাগ্নি, বজ্রপাত, জলপ্লাবন ইত্যাদি—ইহার ফলে একদিকে যেমন ধ্বংস হইতেছে, তেমনি অপরদিকে নূতন নূতন সৃষ্টিও হইতেছে। সত্য ও ন্যায়ের অপলাপ, একের প্রতি অন্যের অত্যাচার ইত্যাদি নৈতিক দুঃখ ঐ সমস্ত দুর্নীতি দূর করার সহায়তা করে। ঐ সমস্ত দুর্নীতিতে লোক দুঃখ ভোগ করিয়াই তাহা সংশোধনের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, যে সমস্ত ব্যাপার আমরা একদিকে দুঃখাত্মক মনে করি, তাহারা অন্য দিকে সুখাত্মকও

বটে। মূল তত্ত্ব হইতে নিজকে পৃথক করিয়া ভোগ ইচ্ছার ফলে এবং সমগ্রের দিকে দৃষ্টির অভাবে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি। সমগ্র বা ভূমার ভিতর দিয়া জাগতিক ব্যাপার আস্বাদন করিলে সুখও নাই, দুঃখও নাই – আছে শুধু নিজ স্বরূপের আস্বাদ। তাহা কবির, শিল্পীর, বৈজ্ঞানিকের, প্রেমিকের, জ্ঞানীর, নিষ্কাম কর্ম্মীর নিজ নিজ বিষয়ের আস্বাদ, ইহাতে "সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ।" এ সুখ শারীরিক সুখ নয়, ইহা আত্মারামের সুখ। জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই প্রেম-তত্ত্বের অসঙ্গতি হয় না।

৩। রস আস্বাদন ও রস বিস্তারের জন্যে বহু ও নানার যে ভেদ, তাহা এক রসেরই স্বরূপগত। ঐ এক রস বহু ও নানা দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেছে না। বহুতে একত্বই রসের স্বরূপ। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যুক্ত বহু ও নানা—রসের দ্বারা সামঞ্জস্য হইতেছে এবং এই সামঞ্জস্যেতেই রসের পুষ্টি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বগত উক্তিতে আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে,—

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়॥
রাধা-প্রেম বিভু আর বাড়িতে নাহি ঠাঁই।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তাঁর বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মন্মাধুর্য্য রাধা-প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥
গোপী প্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়য়ে প্রেমে হঞা মহা তুষ্টি॥"

শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব হইলেও রাধা-প্রেম আস্বাদনে তাঁহার চিন্ময় মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ রাধা প্রেম বিভু হইলেও মাধুর্য্য আস্বাদে বৃদ্ধি হয়। প্রেমতত্ত্বে রসের স্বরূপ ক্রম-বর্দ্ধনশীল। এই প্রবাহই প্রেমরসের আস্বাদন অখণ্ড ও অনন্ত করিতেছে।

৪। প্রেমরসের অস্তিত্ব, বিজ্ঞান আগারে যান্ত্রিক পরীক্ষা বা গবেষণা দ্বারা ধরা পড়ে না। কিন্তু ঐ পরীক্ষা ও গবেষণার চরমে এক অদ্বিতীয় মহাশক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায়। ঐ শক্তি, অণু-পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বিশাল স্থির নক্ষত্র মণ্ডল, যাহার প্রত্যেকটী একটী সৌর জগৎ, তাহাদের প্রত্যেককে আকর্ষণ বিকর্ষণ করিয়া তাহাদের গতি স্থির রাখিতেছে। ইহাই মহা আকর্ষণ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং বিজ্ঞানাগারে যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা এই মহাশক্তির নিত্য নব নব বিকাশ আবিষ্কৃত হইতেছে। পরলোকগত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Jeans তাঁহার Mysterious Universe নামক গ্রন্থে উক্ত মহাশক্তির আলোচনায় বলিয়াছেন যে, ঐ শক্তিতে একটী System অর্থাৎ শৃঙ্খলা দেখা যায়। এই শৃঙ্খলাই রস বা প্রেম-তত্ত্ব। জাগতিক

প্রপঞ্চে যে বহু ও নানা দেখা যায়, তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে বলিয়াই ঐ বহু ও নানার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। আত্ম-চৈতন্য-যুক্ত চিৎশক্তির যে অস্তিত্ব আমরা সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতেছি, তাহাই এই শৃঙ্খলার মূল। সুতরাং বৈজ্ঞানিক Jeans প্রাকৃতিক জগতে যে System আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আত্ম-চৈতন্য-যুক্ত চিৎশক্তি এবং এই চিৎশক্তিই আনন্দময় রস।

৫। প্রেমতত্ত্বে যেমন এক বহু হইতেছে, তেমনি ঐ বহুও একের আকর্ষণে একের সহিত মিলিত হইতেছে। প্রেমতত্ত্বের ইহা একটী মূল বিষয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে আমরা এই তত্ত্ব পাই,—

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্" ॥ ৫

ইহার অর্থ,—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হইলা এক ঠাঁই॥" ১।৪।৪৯-৫০

এক বহু হওয়া এবং বহু পূর্ণতর এক হওয়া, এই প্রবাহের বিরাম নাই। পরস্পর পরস্পরের তৃষ্ণায় যেন চির তৃষিত। "তৃষ্ণা-শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর,"—"বিষামৃতে একত্র মিলন" ইত্যাদি বাক্যে এই তত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে।

ইহাতে সর্ব্বদাই বিরহ ও মিলন আছে। পূর্ণ-পূর্ণতর-পূর্ণতম রূপে পাওয়ার তৃষ্ণাই এই বিরহ। অনন্তের পাওয়ার অন্ত নাই, তাই বিরহেরও অন্ত নাই।

৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজে প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী-শক্তি রাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হওয়ার তত্ত্ব বর্ণিত আছে,—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

এই শ্লোকটীতে ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটী কামনা পরিপূর্ণ না হওয়াই, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের কারণ বলা হইয়াছে। ব্রজলীলায় রস আস্বাদনের বিষয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। রসের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিস্বরূপা ব্রজের গোপ-গোপী ও অন্যান্য বস্তু আদি। এই বিষয় ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ-জনিত বিষয়ের আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণের; কিন্তু আশ্রয়ের আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণের নাই। বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ব্রজের গোপ-গোপীগণ যে আস্বাদন করেন, তাহা আস্বাদন করিতে শ্রীকৃষ্ণের কামনা হয়।

"দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥" ১।৪।১২৭-১২৮

এই দর্পণই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। এই তিনটী কারণের

একটী রসতত্ত্ব, দ্বিতীয়টী বিষয়-তত্ত্ব, এবং তৃতীয়টী আশ্রয়-তত্ত্ব। এই তিন তত্ত্বের সম্মিলিত অবস্থাই প্রেম-তত্ত্ব। প্রেমের আশ্রয় ও বিষয় রসেতে মিলিত হইতেছে, আবার রসই আশ্রয় ও বিষয়কে ভাঙ্গিতেছে। এইরূপ ভাঙ্গা ও গড়াতে রস নিত্য নব-নবায়মান হইতেছে। এই ভাঙ্গাগড়ার প্রকার চির-নিত্যবিরহ ও মিলন। বিরহ ও মিলন প্রেম-তত্ত্বের স্বরূপগত অবস্থা। পূর্ণ মিলনের মধ্যেও প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ বিরহ আছে।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখনু—
হিয়া তহুঁ শীতল না ভেল॥"

আবার পূর্ণ বিরহে তন্ময় হইয়া ভাব-সম্মিলন হয়।

"প্রিয় বিরহ যত তীব্র, প্রিয়ের ভাবনা তত গভীর। ভাবনা যত গভীর, ধ্যান তত স্পষ্ট। ধ্যান যত স্পষ্ট, ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে মিলন তত নিবিড়। বিরহিণী শ্রীরাধার বেদনা যখন পূর্ণতায় পৌঁছিল, ভাবময়ীর কৃষ্ণ-ভাবনা তত চরমে আসিল। ভাবনার চরমে ভাবময় বস্তুর সঙ্গে মিলনানন্দের পরাকাষ্ঠা ফুটিয়া উঠিল। বিরহের শেষ অবস্থায় (দশম দশায়) শ্রীরাধার অন্তর রাজ্যটি শ্রীকৃষ্ণ-ময়। বাহিরে কেবল শ্রীরাধার রূপটী, ভিতরে ভাবের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পূর্ণতম রূপে বিরাজমান।" *

এই আলোচনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের কারণ একদিকে যেমন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় জাতীয় রস

* শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারীকৃত শ্রীশ্রীহরিপুরুষ ধ্যান-মঙ্গল।

আস্বাদনের কামনা, অন্য দিকে তেমনি শ্রীমতী রাধিকার বিষয় জাতীয় রস পূর্ণতম রূপে আস্বাদনের চেষ্টা। দ্বিতীয় এই কারণটি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু 'হরিকথা' নামক গ্রন্থে "বড় দুঃখে এক্ রে", "মহাযোগ বিরহ প্রতাপে" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

৭। প্রেমতত্ত্বের ভাঙ্গা গড়ার এই স্বরূপ আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই।

"স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ; স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।" ১।৪।৩

এই মন্ত্রে মূল তত্ত্ব যাহাকে 'সঃ' বলা হইয়াছে, তিনিই রমণ ইচ্ছায় ভেদ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রী-পুরুষ আকারে পরস্পর আলিঙ্গিত হইয়াছেন। এই ভেদ 'আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ' অর্থাৎ নিজেই নিজকে দ্বিধা করেন। এই ভেদ হইয়া মিলনের ফল ঐ উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণে একবিংশ মন্ত্রে আছে।

"তদ্বা অস্যৈতদতিছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপম্। তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্॥

এই শ্রুতিতে প্রথম ভেদের পর পরস্পর মিলনকে 'অতিছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপং' বলা হইয়াছে। তাহা কিরূপ? যথা—প্রিয়াস্ত্রীর সহিত সম্পরিষ্বক্ত বাহ্য ও আন্তরজ্ঞান শূন্য রস যুক্ত এবং প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত পুরুষের সম্পরিষ্বক্ত বাহ্য আন্তর

জ্ঞানশূন্য অবস্থা। এই যে রূপটি ইহাই ইহার আপ্তকাম, আত্মকাম ও শোকহীন রূপ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ, যাহা উহার দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। তাহার পঞ্চম ও চতুর্দ্দশ শ্রুতি আলোচনা করিলে, প্রেমতত্ত্বের এই ভাঙ্গা গড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। পঞ্চম শ্রুতিতে আত্মার সম্বন্ধেই জগতের সমস্ত কিছু প্রিয় হওয়ার কথা বলিয়া চতুর্দ্দশ শ্লোকে ঋষি বলিতেছেন, যখন 'দ্বৈতমিব ভবতি' তখন এই প্রিয়ের আস্বাদ হয়। এই দ্বৈতই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকে উল্লেখিত 'প্রণয়-বিকৃতি'। কিন্তু যখন 'সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ', তখন আর দ্বৈত বোধ থাকে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্য শ্লোকে যে 'তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং' উল্লেখ আছে, তাহাই এই অবস্থা। ইহাতে দেহস্মৃতি লোপ হইয়া 'না সো রমণ না হাম রমণী' এই ভাব হয়। এই সব মন্ত্রের বিস্তারিত আলোচনা ব্রজলীলাতত্ত্ব অধ্যায়ে করা হইবে।

৮। প্রেমতত্ত্বের এই ছন্দ অর্থাৎ একের বহু হওয়া, বহুর উন্নত-তর এক হওয়া, বহির্জগতে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশবাদ, এই তত্ত্বের উপরেই স্থাপিত। বর্ত্তমানে আণবিক শক্তি বিশ্লেষণে এই তত্ত্ব সমর্থিত হইতেছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, জগতে আমরা যত কিছু বিভিন্ন রকমের পদার্থ দেখি, আণবিক অবস্থায় তাহারা সমস্তই এক। এই আণবিক শক্তিই আকর্ষণ করিয়া নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্কগণের স্থান-স্থিতি ও গতি রক্ষা করিতেছে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ যুগে এক ও অদ্বয় অতি বৃহৎ সত্ত্বাকে যে শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি করিয়াছিল,

সেই শক্তিই উক্ত সৌরমণ্ডলের এবং তাহাদের গ্রহ-উপগ্রহগণকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিয়া তাহাদের গতি স্থির রাখিতেছে। যে এক তত্ত্ব বহু হইয়াছিল, তাহাই আবার এই বহুকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করিয়া সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। অন্তর্জগতে আমরা বহির্জগতের এই ছন্দ সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টি মানবের ভিতরে যে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার ভাব আছে, তাহারই ফলে পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা হইতেছে। গত দুই মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সর্ব্বজাতির একতা-সঙ্ঘের যে চেষ্টা, তাহা মহা প্রেমসিন্ধু তরঙ্গের উত্থান ও পতন। যুদ্ধের সময় ঐ সিন্ধু নিম্নগামী হইয়া, পরে অধিকতর উচ্চগামী হয়। প্রভু জগদ্বন্ধু-সুন্দরের ভাষায় মহাপ্রলয় ও মহাউদ্ধারণ এক প্রেম-তত্ত্বেরই ছন্দোময়ী গতি-তরঙ্গের দুই প্রান্ত। বহির্জগতে আমরা যে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা দেখিতে পাই, তাহার মূল অন্তর্জগতের রস ও করুণায়, প্রীতি ও ভালবাসায়। জগতের সমষ্টিতে রস ও করুণা আছে বলিয়াই অন্তর ও বহির্জগতে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা হইতেছে। এই সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা জড় বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে থাকা কল্পনা করা যায় না। জড়ের ধারণাই এই যে, জড়-পদার্থ এক থাকিয়া বহু হইতে পারে না, বা ঐ বহুতে এক থাকিতে পারে না। সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার যে ধারণা, তাহা আমরা একমাত্র চৈতন্যে বুঝিতে পারি। চৈতন্যের যে আনন্দ ও মাধুর্য্যের আস্বাদ আছে, তদ্দারাই সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা হইতেছে। ইহা না বুঝিয়া জড় পদার্থ

দ্বারা সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা বর্ত্তমান জগতে সমস্ত অশান্তির মূল। আণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক বোমা রূপে ব্যবহারে বর্ত্তমান সভ্যতার ধ্বংস হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ঐ আণবিক শক্তিরই গঠনাত্মক ব্যবহারে, উচ্চতর সভ্যতার সম্ভাবনাও হইয়াছে। এই গঠনাত্মক ব্যবহারই সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে। এই ব্যবহার অন্তর্জগতের। ধ্বংসাত্মক বোমা রূপে ব্যবহার, উহা জড় পদার্থ রূপে ব্যবহার। তবে এই ধ্বংসও গঠনের পূর্ব্বাভাস হইতে পারে। এই ধ্বংসের সম্ভাবনা দ্বারা প্রেমতত্ত্ব অপ্রমাণিত হয় না।

৯। মূলতত্ত্ব নিজের রস, নিজে আস্বাদনের জন্য নিজেকে বিস্তার করে এবং সেই বিস্তার দ্বারাই কাল ও দেশ সীমাগত হইয়া অনন্ত ও বিভুকে জগতে প্রকাশ করে, এই কথা সমস্ত উপনিষদেই পাওয়া যায়। উপনিষদের ঐ সমস্ত মন্ত্রে ব্রহ্মকে যেমন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' বলা হইয়াছে, তেমনই 'রসো বৈ সঃ' ইহাও বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানগম্য, তেমনই রসেতে আস্বাদ্য। জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্যই এইখানেই। ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদের মন্ত্র উল্লেখ করিয়া, এই উক্তির সমর্থন করা যাইতেছে।

১০। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—ব্রহ্মানন্দবল্লী,—প্রথম অনুবাক্,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রটিতে ব্রহ্মকে সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত বলা হইয়াছে। ইহার পরই ঐ ব্রহ্ম হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্, পৃথিবী, ঔষধি, অন্ন ও পুরুষ উৎপন্ন হওয়ার বিষয় উল্লেখ আছে। আচার্য্য শঙ্কর এইমন্ত্রের ভাষ্যে

বলিয়াছেন—"সত্য অর্থাৎ যাহা যেরূপে নিশ্চিত হয়, সে যদি সেই রূপেই থাকে, কখনও অন্যথা না হয়, তবেই তাহা সত্য। 'সত্যং ব্রহ্ম' এই কথাটী ব্রহ্মের বিকার ভাব নিবারণ করিতেছে। ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ বলায় ব্রহ্মের কারণত্বও সিদ্ধ হয়; কিন্তু ব্রহ্মের কারণত্ব মৃত্তিকা প্রভৃতি জড় বস্তু ঘটের যেরূপ কারণ সেরূপ নহে। 'জ্ঞানং ব্রহ্ম' বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের কারণত্ব জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে। ব্যবহারিক জ্ঞান যেমন শান্ত, পরিচ্ছন্ন বা ধ্বংসশীল, ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপ নহে, তাহা অনন্ত;—ইহা বলিয়াই আচার্য্য শঙ্কর একটী জটিল প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে,—"ব্রহ্ম সত্য অর্থাৎ নির্ব্বিকার এবং অনন্ত হইয়াও কি প্রকারে জগতের কারণ ও জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারেন? জ্ঞানে সাধারণতঃ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদ থাকে এবং যাহা কারণ, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, তাহার বিকার হয়। সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও সৃষ্টি-কর্ত্তা হইলে তাহা অনন্ত ও নির্ব্বিকার হইতে পারে না।" এই প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর যাহা দিয়াছেন, তাহাতে শঙ্করের মায়াবাদ অর্থাৎ জগৎ-মিথ্যা-বাদ স্থাপন করার চেষ্টা হইলেও গভীরভাবে আলোচনায় তাহা সমর্থিত হয় না। শঙ্কর বলিয়াছেন,—ব্রহ্মের কার্য্যতা ও জন্যতা "উপচরিত।" এই শব্দটির অর্থ শঙ্কর নিজেই পরবর্ত্তী দুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। শঙ্কর বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মের কারণত্ব ও জ্ঞান সূর্য্যগত প্রকাশের ন্যায় এবং অগ্নিগত উষ্ণতার ন্যায়।" শক্তি ও শক্তিমানের যে সম্বন্ধ তাহাই এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ পায়। শঙ্কর আরও বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মজ্ঞান পৃথক্ নহে।" বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপই বটে। এই স্বরূপ জ্ঞানী

সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় অন্য জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়ের অপেক্ষা করে না। এই জ্ঞান ও স্বরূপই নিত্য। যত প্রকার ভাব পদার্থ আছে, তৎসমূহের সহিত একই কালে, একই স্থানে উহা অবস্থিত, উহা কাল ও দেশেরও কারণ। উহা ছাড়া ব্যবহিত বা দূরবর্ত্তী বা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে অন্য অবিজ্ঞেয় বস্তু নাই। এই জন্যই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে নিত্য, তাহার কারণ তিনি বিজ্ঞাতৃস্বরূপ হইতে অপৃথক্। তাঁহার বিজ্ঞাতৃ বা বিজ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়াদির সাপেক্ষ নহে। শঙ্কর উপচরিত শব্দটী যে ভ্রমাত্মক অর্থে ব্যবহার করেন নাই, তাহা এই ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায়। 'উপচরিত' ও 'স্বরূপ' এই দুইটী শব্দের পার্থক্য বুঝিতে হইলে, আকাশ আদি সৃষ্টি ব্রহ্ম কিভাবে করিলেন, তৎ বিষয়ে এই মন্ত্রটীতে যে বাক্যটি আছে, তাহা লক্ষ্য করা উচিত। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মান আকাশঃ সম্ভূতঃ।" ইহার অর্থ—'তস্মাৎ' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ,' সেই হেতুতেই 'আত্মনঃ (নিজ হইতেই) আকাশঃ সম্ভূতঃ।' ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সৃষ্টির মধ্যগত মানুষের পক্ষে মনে হয়, ব্রহ্ম যেন বিকৃত হইয়াই আকাশ আদি সৃষ্টি করিলেন। এই ধারণাই ভ্রম। জ্ঞান হইলে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম ছাড়া আকাশ আদি সৃষ্ট বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। আকাশাদির পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনাই 'উপচরিত' 'বাচারম্ভণ' মাত্র। মানুষের পক্ষে উহার ব্যবহারিক সত্যতা থাকিলেও পারমার্থিক সত্যতা নাই। এই ভাষ্যে শঙ্কর 'জ্ঞান' শব্দটীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রেমেরই অঙ্গ। ইহা রসেতে পর্য্যবসিত

হইলেই প্রেমতত্ত্ব হয়। মানুষ নিজকে অন্য সকল হইতে পৃথক করিয়া নিজেই ভোগ করিবার যে ইচ্ছা, তাহাই মায়া বা কাম। নিজেকে ব্রহ্ম বা ভূমার সহিত নিত্য ও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধযুক্ত মনে করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া সেই ব্রহ্ম বা ভূমার রসের যে আস্বাদন এই ভাবই প্রেম। ব্রজলীলার ইহাই মূল।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

চৈঃ চঃ—১।৪।১৪১

পূর্ণ জ্ঞানে বুঝা যায় যে, অহং ভাবযুক্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান 'রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায়' ভ্রমাত্মক। রজ্জু যেমন সর্প নহে, তদ্রূপ অহং কর্ত্তা নহে। অহং ও কর্ত্তার প্রকৃত সম্বন্ধ যে রসের সম্বন্ধ, তাহা বোধ হইলে ঐ সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্য্য হয়। যে পর্য্যন্ত এই রসের সম্বন্ধ বোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত অহং কর্ত্তা নয়, মাত্র এই বোধ থাকে; তাহাতে কোন কর্ম্ম থাকে না। প্রেম ও জ্ঞানের ইহাই পার্থক্য। জ্ঞান ও প্রেমের কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই। প্রেম জ্ঞানেরই পরিশিষ্ট।

১১। সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশ আদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার কথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে উল্লেখিত আছে তাহার প্রকার ঐ উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকে প্রথম মন্ত্রে দৃষ্ট হয়।

"সোঽকাময়ত।—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।

নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চা-বিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।"

অনুরূপ মন্ত্র প্রশ্ন-উপনিষদে প্রথম প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্রে আছে—"প্রজাকামো হ বৈ প্রজাপতিঃ, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি॥"

ব্রহ্মের কামনা ও তপস্যা সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকে প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মের কামনা ও তপস্যা সত্য ও জ্ঞানময় এবং ব্রহ্মের আত্মভূত বিশুদ্ধ। প্রজা সৃষ্টির কামনা অর্থ ব্রহ্মের ভিতরে যে সমস্ত নাম-রূপ অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমস্ত নাম ও রূপ সমূহ অভিব্যক্ত করা অর্থাৎ আত্মাতে সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত নাম-রূপাত্মক জগৎকে অভিব্যক্ত করা। ব্রহ্ম যে সময় আত্মস্থিত অনভিব্যক্ত নাম ও রূপ রাশিকে অভিব্যক্ত করেন, সে সময়ও ব্রহ্মের স্বীয় রূপ পরিত্যক্ত হয় না এবং ঐ নাম ও রূপ সকল অবস্থায় সকল স্থানে ও সকল সময়ে ব্রহ্মের সহিত অবিযুক্ত থাকিয়াই পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে-ইহাই ব্রহ্মের বহু হওয়া। জাগতিক নাম-রূপ ব্রহ্ম দ্বারাই আত্ম লাভ করে। উক্ত নাম-রূপাত্মক উপাধি দ্বারাই ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারভাগী হইয়া থাকেন। ইহাই জগতে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ। নিজের স্বরূপ রক্ষা করিয়াই তিনি জগতে প্রবেশ করেন। তাই ব্রহ্মকে সৎ-অসৎ নিরুক্ত-

অনিরুক্ত নিলয়-অনিলয় বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান সত্য-অনৃত প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণময় বলা যায়।

১২। ঐতরেয় উপনিষদে প্রথম অধ্যায় প্রথম খণ্ড প্রথম মন্ত্রে আছে,—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।
স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি॥"

আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—"আত্মা স্বভাবতঃই সর্ব্বজ্ঞ ; এই জন্য তিনি এককই ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জ্ঞান-সাধন-দেহেন্দ্রিয়াদি কিছুই ছিল না, তখন তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন কি প্রকারে? ইহার উত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন, সর্ব্বজ্ঞতা ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ ; সুতরাং জ্ঞানের জন্য তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির আবশ্যক হয় না। তিনি 'পদ-রহিত, অথচ দ্রুতগামী', 'হস্ত-রহিত, অথচ গ্রহীতা' ইত্যাদি অন্য উপনিষদের মন্ত্রে ব্রহ্মের কর্ম্মেন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, ইহার উল্লেখ আছে। ইহার কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার কর্ম্ম ও জ্ঞান তাঁহা হইতে পৃথক নয়। এইরূপ মন্ত্র লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদ উল্লেখে ব্রজলীলা স্থাপন করতঃ ব্রজলীলা তত্ত্বের রহস্য সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন।

১৩। ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের বিস্তারিত বিবরণ আমরা ঐতরেয় উপনিষদে পাই। ঐ উপনিষদে ব্রহ্মের ঈক্ষণে সৃষ্টির কথা নিম্নলিখিত ক্রমে বলা হইয়াছে, যথা ;—

(ক) অম্ভঃ (জল) আদি লোক।

(খ) জল-প্রধান পঞ্চভূত হইতে পালকরূপে অবয়ব আদি সংযোজনপূর্ব্বক বৃদ্ধিসাধনকরতঃ লোকসমূহের পালক, লোকপাল।

(গ) পুরুষাকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া সঙ্কল্প দ্বারা ঐ পিণ্ডের মুখ-বিবর—বাগিন্দ্রিয় ও তাঁহার দেবতা—অগ্নি অভিব্যক্ত হইল। ঐরূপ নাসিকা—ঘ্রানেন্দ্রিয় ও দেবতা—বায়ু; চক্ষুঃ—দর্শনেন্দ্রিয় ও দেবতা আদিত্য; কর্ণ—শ্রবণেন্দ্রিয় ও দেবতা—দিক্‌সমূহ; ত্বক্—স্পর্শেন্দ্রিয় ও দেবতা—বনস্পতি; হৃদয়—মননেন্দ্রিয় ও দেবতা—চন্দ্র; নাভি—পায়ু ও দেবতা—মৃত্যু; শিশ্নঃ—রেতঃ ও দেবতা—অপ্। এই সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্রহ্ম সঙ্কল্প দ্বারা অভিব্যক্ত করিলেন।

(ঘ) অগ্নি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপস্থিত হইল।

(ঙ) ঐ দেবতাগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পূরণের জন্য গো প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর আশ্রয় স্থান করিয়া, পরিশেষে পুরুষাকৃতি দেহ সৃষ্টি হইলে ঐ দেহই সৎ কর্ম্মসাধনের নিদান হইল। বাগিন্দ্রিয়ের অধিদেবতা অগ্নি—মুখে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিদেবতা বায়ু—নাসিকায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিদেবতা আদিত্য—অক্ষিরন্ধ্রে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিদেবতা দিক্‌সমূহ—কর্ণে, ত্বগিন্দ্রিয়ের অধি-দেবতা বনস্পতিসমূহ—ত্বকে, মনের দেবতা চন্দ্র—হৃদয়ে, অপানেন্দ্রিয়ের অধিদেবতা মৃত্যু—নাভিতে এবং উপস্থের অধিদবেতা রেতঃ—শিশ্ন মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহার পর

পিপাসা ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ও তাহার অধিদেবতায় আশ্রয় পাইল।

(চ) ক্ষুৎপিপাসার ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের যোগে ভোগের জন্য অপ্ ঘনীভূত হইয়া অন্ন হইল। ঐ অন্ন বাক্য, ঘ্রাণ, জ্যোতি, শব্দ, স্পর্শ, মন, শিশ্ন, অপান দ্বারা গ্রহণ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্ম বিদৃতি দ্বারে জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ দ্বারটী সানন্দ অর্থাৎ আনন্দদায়ক। ইহাই ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ। ইহা দ্বারাই তিনি তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়াছি বলিয়া প্রীতিবোধ করিয়াছিলেন। শঙ্কর ইহার ভাষ্য করিয়াছেন,—জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারী, অসংসারী, সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্ম আপনার অতিরিক্ত কোনও বস্তুর সাহায্য না লইয়া আকাশ আদিক্রমে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তিনি নিজেই আপনাকে জানিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আমি হইতেছি এই ব্রহ্ম-স্বরূপ, এইরূপে স্বীয় আত্মাকে যথাযথরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন।

১৪। ছান্দোগ্য উপনিষদে—ষষ্ঠ অধ্যায়ে—দ্বিতীয় খণ্ডে—তৃতীয় মন্ত্রে আছে,—

“তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত; তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে॥”

এই মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্য করিয়াছেন,—“আমি বহু হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে উৎপন্ন হইব, ইহাই ব্রহ্মের ঈক্ষণ। মৃত্তিকা যেরূপ ঘটাদির আকার এবং রজ্জু প্রভৃতি যেরূপ মনঃকল্পিত সর্পাদির আকার,

তদ্রূপ কি? না তাহা নহে। সৎপদার্থ ব্রহ্মই বিবিধ 'দ্বৈতাকারে', 'অন্যরূপে', গৃহীত হয়।" 'বিবিধ', 'দ্বৈতাকারে', 'অন্যরূপে', এই সমস্ত শব্দ দ্বারা শঙ্কর ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া জগৎকে মনে করা, রজ্জুতে সর্পভ্রমরূপে গ্রহণ করার ন্যায় ভ্রমাত্মক, কাল্পনিক বা ব্যবহারিক সত্য বলিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে অন্যরূপে গ্রহণ না করিয়া যদি ব্রহ্মেতেই জগৎ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা ভ্রম বলেন নাই।

১৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ সপ্তম মন্ত্রে আছে ;—

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি, তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি, স এব ইহ প্রবিষ্ট আ নখাগ্রেভ্যেঃ। যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে॥"

এই মন্ত্রে ব্রহ্মের অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত ভাবের উল্লেখ করিয়া, নাম-রূপাদিযুক্ত বিষয় ব্রহ্মেরই ব্যাকৃত ভাব বলা হইয়াছে। ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত—যেমন—কোষ-বদ্ধ ও কোষ-মুক্ত তরবারি। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—যেমন— অগ্নি ও তাহার ইন্ধন। প্রথম দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের আবরণ ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ঐ ব্রহ্মের ঐ আবরণের ভিতর দিয়া প্রকাশ বুঝা যায়। কোষ-বদ্ধ তরবারি যেমন দেখা যায় না, তদ্রূপ অব্যাকৃত ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গোচর নহে। ইন্ধন প্রজ্জ্বলিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ভিতরস্থিত অগ্নি দেখা যায় না। ব্রহ্মও সেইরূপ ব্যাকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাকৃত জ্ঞানের সীমার মধ্যে আসেন না। আবরণরূপ কোষের ও ইন্ধনের ভিতরে তরবারি ও

অগ্নির ন্যায় ব্রহ্ম ব্যাকৃত জগতে ওতঃপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট আছেন, ইহাও ঐ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যাইতেছে। ইহার পরেই ঐ মন্ত্রে আছে যে ব্রহ্ম ঐরূপে জগতে প্রবিষ্ট থাকিলেও "তং ন পশ্যন্তি।" ইহার কারণ ঐ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, সেই ব্রহ্মকে পৃথক পৃথক ক্রিয়াতে ও নাম ও রূপেতে সাধারণতঃ ধারণা করা হয়। তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে যে, কখনও বা ব্রহ্মকে "প্রাণন্নেব প্রাণো", কখনও বা "বদন্ বাক্", কখনও বা "পশ্যন্ চক্ষুঃ", কখনও বা "শৃন্বন্ শ্রোত্রং", কখনও বা "মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি" ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ করা হয়। এই সমস্ত পৃথক পৃথক নাম "কর্ম্মণামান্যেব" অর্থাৎ কর্ম্ম অনুযায়ী নাম। এইরূপ কর্ম্ম অনুযায়ী নামে ব্রহ্ম সমগ্রভাবে প্রকাশিত হন না। ব্রহ্মকে সমগ্রভাবে পাইতে হইলে, ঐ মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

আত্মেত্যে বোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি, তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য।" ইহার অর্থে এই,—আত্মা বলিয়াই ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে। এই আত্মাতেই উক্ত ঔপাধিক গুণসমূহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই যে পরিপূর্ণ আত্মা, ইহাই সর্ব্বজীবের একমাত্র পদনীয় বা গন্তব্যস্থল। এতদ্বিজ্ঞানেই সর্ব্ববস্তু লাভ করা যায়।

শঙ্কর এই মন্ত্রে উল্লিখিত ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত অবস্থার ভাষ্য করিয়াছেন যে, দৃশ্যমান্ ব্যক্ত জগতে যেরূপ নিয়ন্তা পরিচালক প্রভৃতি [illegible] বশিষ্ট কারকাদির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই অব্যাকৃত জগৎ সম্বন্ধেও ঐ সমস্ত নিমিত্তাদির সৎভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিশেষ,

একটী ব্যক্ত, আর অপরটী অব্যক্ত। শঙ্কর-ভাষ্যে—আরও আছে যে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই অবিকৃতভাবে অর্থাৎ অন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাই প্রেম-তত্ত্বের অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ভেদ এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব।

১৬। অবিকারী সত্য-স্বরূপ এবং অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও বিকারী জগৎ ও শান্ত জ্ঞানের কারণ হইয়াও ব্রহ্মের স্বরূপত্বের হানি না হওয়ার রহস্য শ্বেতাশ্বতর, ঈশ প্রভৃতি উপনিষদের শান্তি বচনে পাওয়া যায় ;—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরি ওঁ॥

এই মন্ত্রটীর অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়ের গোচর স্থূল, সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ ব্যাপ্ত। সমস্তই পূর্ণব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ণস্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা জগৎ ব্যাপ্ত হইলেও পূর্ণতার অভাব হয় না।

১৭। ব্রহ্মের ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকের প্রথম মন্ত্র ;—

"অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদচেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।"

ঐ উপনিষদের সপ্তম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র ;—

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় উনবিংশ খণ্ড প্রথম মন্ত্র ;—

অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎসদাসীৎ”।

ঐ উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম মন্ত্র,—

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়তঃ॥”

ঐ উপনিষদের ঐ অধ্যায় ঐ খণ্ড দ্বিতীয় মন্ত্র,—

“সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।”

আপাত দৃষ্টিতে এই মন্ত্রগুলি পরস্পর বিরোধ মনে হইতে পারে। আচার্য্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তম অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যে—উল্লেখ করিয়াছেন যে, অসৎ পদে বিশেষ বিশেষ রূপে নামরূপ অভিব্যক্ত বস্তুর বিপরীত ভাবাপন্ন ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন ভাব বুঝাইতেছে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে যে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া “সদের ইদমগ্রে আসীৎ” বলা হইয়াছে, তাহাতে অসৎপদ শঙ্করের ভাষ্যের দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ‘উপনিষদ দর্শন’ নামক গ্রন্থে ‘অসৎ’ শব্দের অর্থে বলিয়াছেন যে, “কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দৃশ্যমান্ জগতে তার (অসতের) অস্তিত্ব আমরা খুঁজিয়া পাইব না; কিন্তু তা যে সত্য, তা যে প্রতিনিয়তই তার প্রভাব চতুষ্পার্শ্বে বিস্তার কর্চ্ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। একটী উদাহরণ দিলে

কথাটী বুঝিতে পারা সহজ হবে। আমরা যেমন সাধারণ সংজ্ঞা Universal বলি বা এই ধরণের বস্তু।” বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই অর্থ আচার্য্য শঙ্করের অর্থেরই অনুরূপ। ইহাই “প্রতিবোধ বিদিতম্।” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব উল্লেখ আছে, তাহারই নামান্তর অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত,—সৎ ও অসৎ,—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্রজলীলাতত্ত্ব অধ্যায়ে ইহার আরও আলোচনা হইবে।

১৮। প্রেমতত্ত্বের রস ও কারুণ্য যে সৃষ্টির কারণ, তাহা ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথম অনুবাকে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” মন্ত্রের পরে চতুর্থ অনুবাকে—

“যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ইতি॥”

এই মন্ত্রটী আছে। ইহার অর্থ—এই ব্রহ্মানন্দকে বাক্য ও মন প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে। সেই ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তাঁহার মরণভয় নিবৃত্ত হয়। এই মন্ত্রে যে ব্রহ্মানন্দ উল্লেখ আছে, তাহাই রস ও কারুণ্য। ইহা বাক্য ও মনের অগোচর—অথচ ইঁহাকে জানা যায়। এই জানা যে কিরূপ, তাহা জগতের অস্তিত্বের আস্বাদনে প্রকাশ হইতেছে। ঐ উপনিষদের ঐ বল্লীর পঞ্চম অনুবাকে আত্মাকে প্রথমতঃ বিজ্ঞানময় বর্ণনা করিয়া তাঁহার অভ্যন্তরস্থ আত্মাকে আনন্দময় বলা হইয়াছে,—

“অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষপূর্ণঃ।”

এই আনন্দময় আত্মা পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞানময় আত্মাকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। এই আনন্দময়—আত্মা 'পুরুষবিধএব' অর্থাৎ পুরুষাকৃতি সম্পন্নই বটে। এই মন্ত্র দ্বারা বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষের পার্থক্য ও সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। ঐ উপনিষদেরই ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তম অনুবাকে আছে, অসৎ হইতে সতের উৎপন্ন হওয়ার পর—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি। যৎ বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ।" ইহার শঙ্করভাষ্যে আছে, ব্রহ্ম নিজেই নিজকে ব্যাকৃত করিয়া সুকৃত অর্থাৎ স্বয়ং কর্ত্তা বলিয়া অবিহিত হইয়া থাকেন। যে হেতু তিনি রস-স্বরূপ, সেই কারণেই তাঁহার সুকৃতরূপে অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সুকৃতি শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ বলিয়াছেন ;—

"সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণ-কৃপা-হেতু পুণ্য"! ৩। ১৬। ৯৩

কৃষ্ণ স্বয়ং কর্ত্তা অর্থাৎ প্রভু এবং জীব তাহার দাস, এই বোধ হইলেই কৃপা বা কারুণ্যের আস্বাদ পাওয়া যায়। শঙ্কর ভাষ্যের সহিত মহাপ্রভুর অর্থের কোন বিরোধ নাই। এই ভাষ্য দ্বারা শঙ্কর বলিতেছেন যে, নিজেই নিজকে অব্যাকৃত রাখিয়া ব্যাকৃত করা যে তত্ত্ব তাহা যদ্দারা সাধিত হয়, তাহাই রস। রসেরই এইরূপ বিরুদ্ধগুণ থাকা সম্ভব।

উক্ত সপ্তম অনুবাকে ব্রহ্মকে 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া ঋষি বলিতেছেন, "রসঃ হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।"

এই মন্ত্রের কতকাংশ প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়া তাহার

শঙ্কর ভাষ্য দেওয়া হইয়াছে। এইস্থানে শঙ্করের ঐ ভাষ্যের সমস্তটুকু দেওয়া প্রয়োজন।

শঙ্কর বলিতেছেন যে, প্রাণাপান আদি চেষ্টা হইতেও রসবান্ ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। জীবিত ব্যক্তির এই দেহপিণ্ড প্রাণের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস আদি প্রাণনকার্য্য করিয়া থাকে এবং অপান বায়ু দ্বারা মল-মূত্র আদি অধোনয়ন, রূপ অপান কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া দৈহিক বায়ুরও ইন্দ্রিয়বর্গের বিবিধ চেষ্টা দেখা যায়। এইরূপ একই উদ্দেশ্যে জড়বর্গের সম্মিলিত ভাবে কার্য্য, তাহা কখনই কোন অসংহত-চেতন-পদার্থের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। এই অসংহত-চেতন-পদার্থের স্বরূপ আনন্দ। যদি হৃদয়-আকাশে এই আনন্দ নিহিত না থাকিত, তবে কেহই প্রাণাপান ব্যাপার করিতে পারিত না। অতএব নিশ্চয়ই ব্রহ্ম আছেন,—যাহার জন্য এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির কার্য্য হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বারাই লোকের আনন্দ সম্পন্ন হয়। শঙ্করের এই ভাষ্য দ্বারা ব্রহ্ম আনন্দময় রস-স্বরূপ ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

১৯। লৌকিক আনন্দও ব্রহ্মানন্দেরই কণা, তাহা আচার্য্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টম অনুবাকের ভাষ্যে বলিয়াছেন। ঐ অনুবাকে আনন্দের একটী পরিমাণ করার চেষ্টা হইয়াছে। সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ একটী মানুষের আনন্দকে একক ধরিয়া, তাহার শতগুণ একটী মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের আনন্দ, তাহার শতগুণ করিয়া একটী দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ, তাহার শতগুণ পিতৃগণের আনন্দ, তাহার শতগুণ দেবগণের আনন্দ,

তাহার শতগুণ কর্ম্মদেবগণের আনন্দ, তাহার শতগুণ যজ্ঞীয়-আহুতি-ভোজী দেবগণের আনন্দ, তাহার শতগুণ দেবরাজ ইন্দ্রের আনন্দ, তাহার শতগুণ বৃহস্পতির আনন্দ, তাহার শতগুণ প্রজাপতির আনন্দ, তাহার শতগুণ ব্রহ্মার আনন্দ। এইরূপ পুনঃ পুনঃ শতগুণ করায় বুঝা যায় যে, এই আনন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে অনন্ত। কিন্তু তাহার মূল পরিমাপক একক একটী মানুষের আনন্দ।

তবে এই আনন্দ বিষয়-ইন্দ্রিয় যোগে সুখ-দুঃখাত্মক যে মনোবৃত্তি হয়, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শঙ্কর এই পার্থক্য দেখাইতে বলিয়াছেন, বস্তুতঃ লোকসিদ্ধ এই আনন্দ দ্বারা বিষয়-ব্যাবৃত অর্থাৎ নির্ব্বিষয়ক বুদ্ধি-মাত্র-গম্য আনন্দকে বুঝা যাইতে পারে। কেননা লৌকিক-আনন্দও ব্রহ্মানন্দেরই অংশ। কেবল অবিদ্যার প্রভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি আবৃত হওয়ায় এবং অজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাক্তন কর্ম্মবাসনা বশে এবং আনন্দজনক বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মা আদি জীবগণ নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে অনুভব করে বলিয়াই ব্যবহারিক জগতে উহা লৌকিক ও অস্থির বা অনিত্য রূপে পরিচিত হয় মাত্র। নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত এই আনন্দের পরিমাণ ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। অবিদ্যা বা কাম্যকর্ম্ম প্রভৃতি দোষের হ্রাস ঘটিলে সেই ব্রহ্মানন্দই আবার যথাযোগ্যরূপে মনুষ্য ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ক্রমোৎকৃষ্ট জীবগণের নিকট এবং অকামহত বিজ্ঞানগণের নিকট উত্তরোত্তর শতগুণ উৎকর্ষসম্পন্নরূপে যথাযথ ভাবে আবির্ভূত হয়। শঙ্করের এই

ভাষ্য সম্পূর্ণরূপে ব্রজলীলাকে সমর্থন করে। এই আনন্দতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে ;—

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈসে মসীবিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥ ২।২।৪২-৪৩

২০। ব্রহ্মানন্দের অতীচ্ছন্দা রূপ নামে একটী উদাহরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ—একবিংশ মন্ত্রে আছে। এই মন্ত্রের উল্লেখ পূর্ব্বেও করা হইয়াছে। আত্মার এই অতীচ্ছন্দা রূপকে সর্ব্বপ্রকার কামনা শূন্য নিষ্পাপ এবং ভয়-রহিত আনন্দ বলা হইয়াছে। তাহা প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গিতে হইলে, যেমন বাহ্য বা অভ্যন্তর কোন প্রকার জ্ঞান না থাকিয়া তন্ময় হইয়া যায়, সেইরূপ। ইহাতে দেহস্মৃতি থাকে না। কেবল এক-রসাত্মক আনন্দবোধ থাকে। ব্রজলীলা অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

২১। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চম ব্রাহ্মণে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে মধুবিদ্যা বর্ণিত আছে। বৃহদারণ্যকে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যাবতীয় প্রাকৃতিক বিষয় মধুময় বর্ণনা করিয়া পঞ্চদশ মন্ত্রে আছে ;—

"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা, তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥"

এই মন্ত্রে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মাণ্ডে মধু বা মাধুর্য্যের এক খনি আছে। রথচক্রের নাভিরন্ধ্রে ও নেমিতে যেরূপ চক্র-শলাকা সন্নিবেশিত থাকে, সেইরূপ ঐ মধুখনি সমস্তভূত, সমস্ত দেবতা, সমস্ত লোক, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত ব্যষ্টি আত্মায় সন্নিবেশিত আছে এবং প্রত্যেকেই ঐ খনি হইতে মধু পান করিতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম হইতে একাদশ খণ্ডে যে মধুবিদ্যা বর্ণিত আছে, তাহাতে অন্তরীক্ষ রূপে মধুচক্র হইতে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোতিঃ-রূপ মধু নিয়ত বর্ষিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। সেই মধু বসুগণ, রুদ্রগণ, বরুণগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ ইত্যাদি যাবতীয় লোকের ভিন্ন ভিন্ন মুখে পান করার কথাও ঋষি বলিয়াছেন। আদিত্যের এই মধু বর্ষণের কাল উদয় ও অস্ত সাপেক্ষ। উহা ক্রমবর্দ্ধমান বলিয়া পরিশেষে একাদশ খণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে উদয় অস্ত বিহীন চির-মধ্যাহ্ন অর্থাৎ কালাতীত এক অবস্থা উল্লেখ করিয়া ঋষি বলিতেছেন,—

"ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।
দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রাহ্মণা ॥
ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা।
হৈবাস্মৈ ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥"

এই মন্ত্রদ্বয়ের সার মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে সমস্ত সুখ-

দুঃখময় পরিবর্ত্তনের মধ্যে পরিবর্ত্তনের অতীত এক নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্যের আস্বাদ পাওয়া যায়। তখন—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমানস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥ বৃ ৬।৩।৬"

এই মধুই রসস্বরূপ প্রেমতত্ত্ব এবং তাহার ফল আনন্দ।
আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি
ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" তৈঃ ৩।৬

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রজলীলা

১। সৃষ্টির মূল যে রস ও কারুণ্য, তাহা পূর্ব্ব প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম সূত্রে আছে,—"লোক-বত্তু লীলা-কৈবল্যম্।" ইহার প্রচলিত অর্থ লীলা-কৈবল্য লোকবৎ। ভাষ্যকারগণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই লীলায় রসস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেই নিজের রস আস্বাদন ও বিস্তার করিতেছেন। কিরূপে এই রস আস্বাদিত ও বিস্তারিত হইতেছে, তাহা, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভগবানের অবতারের

বিবরণ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সমস্ত পৌরাণিক বিবরণের সহিত জাগতিক ব্যাপারের সম্বন্ধ এই যে, অবতারের কার্য্য লৌকিক কার্য্যের আদর্শ-স্বরূপ। লৌকিক কার্য্য দেশ ও কালের সীমায় সম্পন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়, কিন্তু অবতারের কার্য্য নিত্য, উহা দেশ ও কালের অতীত। প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে ব্রহ্মের যে অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, অবতারের কার্য্য ও লৌকিক জাগতিক কার্য্য সেইরূপ সম্বন্ধযুক্ত বটে। জগতে যতপ্রকার ব্যবহারিক বস্তু ও কর্ম্ম আছে, তাহাদের সমস্তরই একটী আদর্শ-স্থানীয় পরিপূর্ণ ভাব থাকা প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিভূতি যোগ নামক দশমাধ্যায়ে যে সমস্ত ভগবদ্বিভূতি বর্ণিত আছে, তাহাতে সমস্ত বস্তুর পরিপূর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থাকেই ভগবদ্বি-ভূতি বলা হইয়াছে। সেইরূপ জাগতিক ব্যাপারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিপূর্ণ যে সমস্ত ভাব, তাহাই ভগবানের অবতার। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে অবতারের সংখ্যা ও বিবরণ বহু প্রকারে বর্ণিত আছে। এই সমস্ত অবতারের বিবরণে অবস্থা, কাল, দেশ ও পাত্র অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তৎ তৎ সময়োপযোগী সমস্ত ঘটনায় অবতারের ঐ সমস্ত কার্য্যকলাপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শস্থানীয়, তাহা বুঝা যায়। এই সমস্ত অবতারের রূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বর্ণিত আছে। ইহাতে মনে করা উচিত নয় যে, ঐ সমস্ত রূপধারী জীব ভগবান্। ঐরূপে ভগবানের কার্য্য তৎসময়োপযোগী এবং ঐ রূপধারী তৎসাময়িক অন্যান্য জীবের আদর্শস্থানীয়। জাগতিক সৃষ্টি

প্রবাহের গতি ঠিক সরল রেখায় নহে। উহা আবর্ত্তনশীল (cyclic)। প্রত্যেক আবর্ত্তনের নাম এক একটী কল্প। প্রত্যেক কল্পেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। ভগবানের অবতার প্রত্যেক কল্পেতেই হইতেছে। এই অবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—চতুর্থ অধ্যায়—ষষ্ঠ শ্লোকে আছে,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

ইহার অর্থ,—আমি জন্ম-রহিত; অবিনশ্বর-স্বভাব এবং প্রাণীগণের ঈশ্বর হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, স্বীয় মায়া আশ্রয় করতঃ স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে আছে,—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥"

ইহার অর্থ,—অল্প বুদ্ধি লোকগণ আমার অব্যয় অনুত্তম-পরমস্বরূপ না জানিয়া, আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন শরীরি বলিয়া মনে করেন। এই দুইটী শ্লোকই ভগবদ্গীতার—চতুর্থ অধ্যায়ে—সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে বর্ণিত আছে।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

ইহার অর্থ,—হে ভারত! যখন ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেই নিজকে আবির্ভাব করি।

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্য-লীলা বিংশ পরিচ্ছেদে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রকমের রূপের ও অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ সহ বহু অবতার উল্লেখিত হইয়াছে। এই সমস্ত অবতারই ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্যের প্রকাশ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে একচত্বারিংশ ও দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে আছে,—

"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্ ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

ইহার অর্থ,—হে অর্জ্জুন ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদি আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই আমার তেজাংশ সম্ভূত বিভূতি বলিয়া জানিবে। আমার ঐশ্বর্য্যের বিষয় বাহুল্য-রূপে জানিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে ইহাই জানিবে যে, আমি একাংশ দ্বারা এই জগৎ সমূহে ব্যাপিয়া রহিয়াছি। এই সমস্ত অবতার ভগবানের এক অংশ হইতে আবির্ভূত হইয়া, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়সাধন করিতেছে। ইহারা সমস্তই অংশ-অবতার; কিন্তু ভগবানের ব্রজলীলা-নায়ক পুরুষোত্তম অংশ-অবতার নহেন। ইহাকে পূর্ণঅবতারই বলা হইয়াছে।

"এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥

ভাঃ—১৩২৮

২। ব্রজলীলা—শ্রীমৎ বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে—তৃতীয় হইতে একোনচল্লিশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের প্রথমাংশ অর্থাৎ তাঁহার জীবনের মথুরা গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অংশ।

প্রত্যেক অবতারেই ধর্ম্ম-সংস্থাপনাদি কার্য্য অল্প-বিস্তর বর্ণিত আছে এবং ঐ বর্ণনায় মাধুর্য্যের আস্বাদনও কিছু কিছু আছে; কিন্তু ভগবানের আংশিক অবতারে ঐশ্বর্য্যই প্রধানতঃ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ অবতারে যে মাধুর্য্য আছে, তাহা ঐশ্বর্য্যের অনুগত। ব্রজলীলায়ও যে অসামান্য ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ আছে, তাহা মাধুর্য্যকেই পুষ্ট করিতেছে। ঐশ্বর্য্যের ঐ লীলায় কোন অধিকার নাই। ব্রহ্মের স্বরূপ রস ও আনন্দ, ইহা প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। ঐ রস এবং আনন্দই ব্রজলীলার মূল, ইহা এই অধ্যায়ে দেখান হইবে।

৩। শ্রীকৃষ্ণ কিশোর। দশ বৎসর আট মাস বয়স পর্য্যন্ত ব্রজে ছিলেন। তাঁহার প্রথমাংশ গোকুলে এবং দ্বিতীয়াংশ শ্রীবৃন্দাবনে। পূতনা-মোক্ষণ, শকট-ভঞ্জন, মা যশোদার শ্রীকৃষ্ণের মুখ-বিবরে বিশ্বরূপ দর্শন এবং দাম-বন্ধনাদি লীলা গোকুলে হয় এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা। এই সব লীলায় বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্য আস্বাদিত ও বিস্তার হইয়াছে। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের উপরে নানা প্রকার উপদ্রব হইতে থাকায়, নন্দ-মহারাজ প্রভৃতি গোপগণ গোকুল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যা'ন। তথায় পৌগণ্ড বয়সে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠলীলা করেন। ইহাতে সখ্য-রসের মাধুর্য্য আস্বাদিত ও বিস্তার হয়। গোষ্ঠ-লীলার মধ্যে বৎসাসুর,

বকাসুর, অঘাসুর বধের পর ব্রহ্ম-মোহন-লীলা হয়। তাহার পর ধেনুকাসুর বধ, যমুনা-হ্রদে কালিয়দমন, দাবানল্ পান, প্রলম্বাসুর বধ এবং অরণ্যাগ্নি পান লীলা শ্রীকৃষ্ণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের কিশোর বয়সে যমুনা পুলিনে বেণুবাদন করিতেন, তৎশ্রবণে গোপ-বালিকাদের পূর্ব্বরাগ জন্মে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নী ব্রত করেন। ঐ ব্রত শেষে গোপীগণ বিবস্ত্রা হইয়া যমুনাতে স্নান করিবার সময়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বস্ত্র হরণ করেন এবং বিবস্ত্রা অবস্থায় তাঁহাদিগকে নিজের নিকট আনিয়া বস্ত্র প্রত্যর্পণ করেন। ইহাই মধুর-রসাত্মক পরম রমণীয় রাস-লীলার সূত্রপাত। পরে যজ্ঞ-দীক্ষিত ব্রাহ্মণ পত্নীগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা, গোবর্দ্ধন ধারণ ইত্যাদি কয়েকটী লীলার পর রাস-লীলা হয়। তাহার পরে শঙ্খচূড়, অরিষ্ট, কেশী, ব্যোমাসুর আদি অসুরকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেন। এই সমস্ত লীলা শেষ হইলে অক্রুর কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে মথুরায় লইয়া যা'ন। এই পর্য্যন্ত ব্রজলীলা শেষ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাওয়ার পর উদ্ধব মহাশয় দ্বারা ব্রজবাসীদের খবর লইয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীবলরাম ব্রজে আসিয়া ব্রজবাসীদের সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে প্রভাস-যজ্ঞ উপলক্ষে ব্রজবাসীরা কুরুক্ষেত্রে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

বংশীগান শ্রবণে গোপ-বালিকাদের পূর্ব্বরাগ হইতে ব্রজ-লীলার শেষ পর্য্যন্ত পরম-মাধুর্য্যময় মধুর রস আস্বাদিত হইয়াছে।

এই সমস্ত লীলার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। এই সমস্ত লীলাতে কি প্রকারে মাধুর্য্যময়-রস আস্বাদিত ও বিস্তারিত হইয়াছে এবং তাহা কতদূর উপনিষদ্ ও তাহার শঙ্কর-ভাষ্য দ্বারা সমর্থন করা যায়, তাহা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিরুপাধি মাধুর্য্যবিগ্রহত্ব প্রদর্শনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তাহার পূর্ব্বে ব্রজলীলার বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

৪। শ্রীকৃষ্ণলীলার দুই রকম প্রকার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে। প্রথম—গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলা, দ্বিতীয়—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের জগতে প্রকট-লীলা। এই দুই প্রকার লীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে,—

"প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণ-বিগ্রহ যৈছে বিভূত্বাদি গুণবান্॥
সর্ব্বগ-অনন্ত-বিভূ বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঙি বিশ্রাম॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল বিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভূ কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি-ভূমি কল্পবৃক্ষময়-বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম॥

প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

১।৫।১১-১৮

এই কয়টী পয়ারে নিত্যলীলাকে প্রকৃতির পার বলা হইয়াছে। সেখানে স্থান ও কালের সীমা নাই। সবই সর্ব্বগ-অনন্ত-বিভূ এবং উপরি ও অধঃ ব্যাপিয়া আছে। কোনও নিয়ম নাই। কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই লীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এই নিত্য ও প্রকট উভয় লীলারই স্বরূপ এক। প্রাকৃত চ'ক্ষে প্রপঞ্চের সম দেখা গেলেও, দিব্য-প্রেম-চ'ক্ষে-তাঁহার নিত্য স্বরূপ প্রকাশিত হয়। ভক্ত অর্জ্জুন যেমন দিব্য চ'ক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্-রূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের অখণ্ড স্বরূপ সামগ্রিকভাবে দর্শন করিয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্রের শঙ্কর-ভাষ্যে আছে, 'দিব্যজ্ঞান হইলে দেখা যায় যে, যতপ্রকার ভাব-পদার্থ আছে, তৎসমূহের সহিত একই কালে একই-দেশে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অবস্থিত। উহা কাল ও দেশেরও কারণ। উহা ছাড়া আর অন্য ব্যবহৃত দূরবর্ত্তী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবিজ্ঞেয় বস্তু নাই। এই জন্যই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ এবং নিত্য।" পরিবর্ত্তনশীল জগতে যেরূপ কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ইত্যাদি আছে, তদ্রূপ ঐ নিত্যধামেতেও কর্ত্তা-কর্ম্ম ও করণাদি থাকার কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে প্রথম মন্ত্রে উল্লেখিত 'পুরুষবিধ' শব্দের শঙ্কর-ভাষ্যে পাওয়া যায়। শঙ্কর বলিয়াছেন,—'এই দৃশ্যমান্ ব্যক্ত জগতে যেরূপ নিয়ন্তা প্রভৃতি

বহুবিধ বিশেষ কারকাদির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অব্যাকৃত জগৎ সম্বন্ধে এই সমস্ত নিমিত্তাদির সদ্ভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে, একটী ব্যাকৃত, অপরটী অব্যাকৃত।' ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ডে উদ্দালক ঋষি তদীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বটবৃক্ষের বীজের মধ্যে যে বৃহৎ বটবৃক্ষের অণিমা রূপে অবস্থিত থাকার বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহাতেও আমরা নিত্য ও প্রকটের ভেদ বুঝিতে পারি।

৫। কোন কোন খ্যাতনামা পাশ্চাত্য-দার্শনিক জগতের মূলে চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর এক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেনযে, মানব জাতির Empirical experience এর মূলে A-priori Universal Ideal না থাকিলে ঐ Empirical experience সম্ভব নহে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার সেই আদর্শের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। এই আদর্শরূপে অবস্থানই নিত্য-লীলা। ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের সহিত এই আদর্শবাদের অসামঞ্জস্য নাই। বৈজ্ঞানিক ডারউইন্ প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন Speciesএর পৃথক পৃথক সৃষ্টি হওয়ার মতবাদ অপ্রমানিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি কতদূর কৃত কার্য্য হইয়াছেন, তাহা এখানে বিবেচনা করা অপ্রাসঙ্গিক। তাহার পর ডারউইন্ বলেন যে, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ও শৃঙ্খলাহীন ভাবে Natural Variation হইতে হইতে Natural selection, Struggle for existence হইতে থাকে এবং পরিশেষে Survival of the fittest হয়। ইহাই জাগতিক সৃষ্টির প্রণালী। সৃষ্টির এই বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, প্রাকৃত

বা যোগ্যতম ব্যাপারে হিসাব-নিকাশের কোন স্থান না থাকিলেও fittest বা যোগ্যতম বলিয়া একটা কিছু আছে। ইহার মধ্যে জাগতিক এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রেমতত্ত্বের আনন্দোচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আনন্দোচ্ছ্বাস একটী আদর্শের দিকে যাইতেছে, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'রসো বৈ সঃ' মন্ত্রের সহিত ডারউইন্‌বাদের কোন অসামঞ্জস্য নাই। উপনিষদে উল্লেখিত ব্রহ্মের ঈক্ষণ, তপস্যা, নিজকে দ্বিধাকরণ, অনুপ্রবেশ, রমণ ইত্যাদি সমস্তই জাগতিক ক্রম-বিকাশের আদর্শ স্বরূপ অধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ। ইহা বিজ্ঞানাগারে বুঝা না গেলেও কেনোপনিষদের ভাষায় "প্রতিবোধ বিদিতং।"

৬। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার নিত্যলীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইবার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার সময় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে,—

"পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোক ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার এক দিনে তেঁহ একবার।
অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট-বিহার॥

চৈঃ চঃ ১।৩।৩—৪

ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মন্বন্তর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগে এক দিব্য যুগ হয়। একাত্তর দিব্য-যুগে এক মন্বন্তর। তাহারই চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন। সেই এক দিনের মধ্যে একবার শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলা জগতে প্রকট হয়। বর্ত্তমানে বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। ইহারই

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট এই লীলা কি প্রকারে হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে,—

'পুতনা বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সর্ব্বলীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাহার নাহিক গণন।
কোন্ লীলা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
এই যত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
কৃষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে।
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য ঘুরে রাত্রি দিনে॥
ঐছে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল-ব্যাপী ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
আলাত-চক্রবৎ সেই লীলা-চক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় ক'রে॥
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় অবস্থান।
তাতে নিত্যলীলা কহে আগম-পুরাণ॥ ২।২০।৩১৫-২৭

এই কয়টী পয়ারের সার অর্থ এই যে, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ব্ব সময় কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে দেশ ও কালের সীমায় নিজকে প্রকট করিতেছেন। বিজ্ঞানের জ্যোতিঃতত্ত্ব দ্বারা ইহা সমর্থন করা যায়। জ্যোতিতে যেরূপ প্রকাশিত হইতেছে, ঐ রূপ ব্রহ্মাণ্ড বিশেষে অদৃশ্য হইলেও কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে উহার প্রকাশ থাকিবেই। সৃষ্টির গতি বৃত্তাকার (cyclic)। সুতরাং

জ্যোতির প্রকাশ আলাত-চক্রবৎ। সাময়িক ভাবে ব্রহ্মাণ্ড বিশেষে অদৃশ্য হইলেও উহার নিত্যত্বের কোন হানি হয় না।

৭। প্রেমতত্ত্বে শক্তি ও শক্তিমান্ প্রসঙ্গে ভেদের কথা বলা হইয়াছে। ব্রজলীলাও এই আদি ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাধা ও কৃষ্ণ শক্তি ও শক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়-প্রেম-বিকৃতির ঘনীভূত রূপই হ্লাদিনীশক্তি শ্রীমতী রাধা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে,—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণ আনন্দ আস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যাঁ'রে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ, শুদ্ধ-সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান, সম্বিতের সার।
ব্রহ্ম-জ্ঞানাদিক সব, তাঁর পরিবার॥

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরাকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণাকান্তা-শিরোমণি ॥
কৃষ্ণ-প্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ-নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥
রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ ;
অগ্নিজ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধ'রে দুইরূপ ॥

এই কয়টী পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে সৎ বলায় বুঝা যায় যে, জগতে যত কিছু সৎ পদার্থ আছে, সমস্তই তিনি অর্থাৎ তাঁহার সত্তাতেই সমস্ত জাগতিক পদার্থের সত্তা। এই সৎ-শক্তিকে সন্ধিনী শক্তি বলা হইয়াছে। সন্ধিনী নামক শক্তির কার্য্য জাগতিক সমস্ত সৎ পদার্থ। এই সন্ধিনী-শক্তির সার অংশ অর্থাৎ যাহা জগতের অতীতেও আছে, তাহাকে শুদ্ধ-সত্ত্ব নাম দিয়া, তাহাতে ভগবানের সত্তাকে স্থাপন করা হইয়াছে এবং ব্রজলীলার মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন ইত্যাদি সমস্তই এই সন্ধিনী-শক্তির বিকার অর্থাৎ ঘনীভূত রূপ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় চিৎশক্তিকে সংবিৎ-শক্তি নাম দেওয়া হইয়াছে। উহাকে "জ্ঞান করি মানি"

বলায়, উহার চৈতন্যময়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্," এই জ্ঞান উক্ত সংবিৎ-শক্তির দ্বারা সাধিত হয়। ঐ জ্ঞানাদি সমস্তই এই ভগবত্তা জ্ঞানের পরিবার অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় তৃতীয় শক্তিকে হ্লাদিনী নাম দিয়া, তাহার সার প্রেম, ভাব ও মহাভাব উল্লেখে শ্রীরাধার স্বরূপ বলা হইয়াছে। এই শক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, যেমন—মৃগমদ ও তাহার গন্ধ এবং অগ্নি ও তাহার জ্বালা অর্থাৎ শিখা।

৯। পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, লীলার রস আস্বাদনই এই মূলীভূত দুই রূপ ধরার কারণ। এই কয়টী পয়ারে ব্রজলীলার সারতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ লীলার পিতা, মাতা, সখা, সখী, দাস, দাসী সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ ; এমন কি, শয্যা, আসন, বস্ত্র, অলঙ্কার, বেত্র, বেণু, গৃহ, বাড়ী, বৃক্ষ, লতা, বন, পুলিন, ফল, ফুল, নদ, নদী ইত্যাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির পরিণতি। জাগতিক ব্যাপারের সহিত ব্রজলীলা-ব্যাপারের পার্থক্য এইখানেই। জগতে এই সমস্ত সম্বন্ধমূলক বিষয়ে পরস্পরের সম্বন্ধ—দেশ ও কাল দ্বারা পৃথক বলিয়া বোধ হয় ; ব্রজে উহা সমস্তই শক্তিমানের সহিত শক্তির রসাত্মক নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত। জগতেও যখন ঐ সমস্ত সম্বন্ধ নিজ স্বরূপের আত্মগত জ্ঞান হয়, তখন উহা আদর্শ-উন্মুখী হইয়া মাধুর্য্যের প্রকাশ করে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ,— তদীয় দাস, মাতা, পিতা, সখা ও কান্তাগণ চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ও ত্বক্ দ্বারা আস্বাদন করিয়া নিজ নিজ দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য

ও মধুর ভাব অনুযায়ী সেবা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ঐ সেবা গৃহীত হয় ইহাই ব্রজলীলার প্রেমতত্ত্বের রস আস্বাদন ও বিস্তার। ইহা শক্তিমানের সহিত স্বরূপ-শক্তির ক্রিয়া এবং জগতের আদর্শ।

১০। জগতে মানুষের সমস্ত ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ মূলক। এই সম্বন্ধ প্রথমতঃ ব্যষ্টি মানুষে মানুষে, দ্বিতীয়তঃ ব্যষ্টি মানুষ ও সমষ্টি মানুষে, তৃতীয়তঃ সমষ্টি মানুষ ও সমষ্টি মানুষে। প্রথম রকমের সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই. পরিবারের ভিতরে—যথা,—পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী, স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবে। দ্বিতীয় রকমের সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই, একক মানুষের সহিত সমাজ ও রাষ্ট্রের। তৃতীয় রকমের সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই, সমাজে-সমাজে, জাতিতে-জাতিতে এবং রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে। এই সমস্ত প্রকার সম্বন্ধের মূল, একক মানুষের মনোবৃত্তির উপর স্থাপিত। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়বোধ (Sensation), জ্ঞান (Knowing), ইচ্ছা (Willing) ও সুখ-দুঃখাত্মক অনুভূতি (Feeling) ইত্যাদি যাহা কিছুর উল্লেখ আছে, তাহাই পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ সৃষ্টি করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ঐ ঐ ইন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ বোধ মূলক জ্ঞান জন্মে। তাহা হইতে সুখ-দুঃখাত্মক অনুভূতির ফলে গ্রহণ ও বর্জ্জনের ইচ্ছা হয়।

এই ইচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া, হস্ত-পদাদি সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় নানাপ্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইত্যাদি মানসিক বৃত্তি এই সমস্ত কার্য্যের কারণ ও ফলও বটে। জাগতিক সমস্ত প্রকার কার্য্যে অর্থাৎ পারিবারিক,

সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্ত ব্যাপারের মূলভিত্তি—ব্যক্তিগত এই সমস্ত মানসিক ক্রিয়া ও কার্য্যের ঘাত-প্রতিঘাত। ইহা একটী আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই আদর্শই ব্রজলীলা। ব্রজলীলায় যে মাধুর্য্য বর্ণিত আছে, জাগতিক সমস্ত ব্যাপারে ঐ মাধুর্য্যের আস্বাদ পাইলেই ঐ সমস্ত ব্যাপার সার্থক হয়।

১১। মাধুর্য্য নানাপ্রকারে আস্বাদিত ও বিস্তারিত হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে মাধুর্য্য আছে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে মাধুর্য্য আছে,—পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে মাধুর্য্য আছে,—জ্ঞান, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রাসায়নিক শাস্ত্র, দর্শনাদি চর্চ্চা ইত্যাদি সমস্ত বিদ্যায় মাধুর্য্য আছে,—দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, ভালবাসা, লোকহিতকর কার্য্য ইত্যাদিতে মাধুর্য্য আছে। এক কথায় জগতের সমস্ততেই একটা মাধুর্য্যের দিক্ আছে। সৃষ্টির অতীতে—অব্যাকৃত অবস্থায় এবং সৃষ্টিতে—ব্যাকৃত অবস্থায় যে মাধুর্য্য ছড়াইয়া আছে, তাহারই ঘনীভূত রূপ ব্রজলীলা। সৃষ্টির অতীতে মাধুর্য্যের ঘনীভূতরূপ—নিত্য-ব্রজলীলা এবং সৃষ্টির মধ্যে মাধুর্য্যের ঘনীভূতরূপ—প্রকট ব্রজলীলা।

১২। সৃষ্টির মধ্যে মাধুর্য্য কারুণ্য রূপে নিজকে প্রকট করিয়া বিস্তার করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি দ্বারা ইহা সাধিত হইতেছে, তাহাকে মায়া ও জীব শক্তি নাম দেওয়া হইয়াছে। মায়াশক্তি প্রকৃতি, যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। মায়া-শক্তি শ্রীকৃষ্ণেরই একটী শক্তি হইলেও তাহা

নিত্য বহির্ম্মুখ অর্থাৎ জগতের সমস্তকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিপরীত দিকে লইয়া যাইতেছে। জীব-শক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। উহা কভু মায়াশক্তির অধীন হইয়া বহির্ম্মুখ হয়, কভু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অধীন হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের উন্মুখী হয়। মনুষ্যজাতি এই জীব-শক্তিরই প্রকাশ। মানুষের এই স্বাধীনতা তাহার বিশেষত্ব। ইহার বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইবে। মানুষের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য ও ব্যবহারের আদর্শ দেখানের জন্যই নিত্য ব্রজলীলা সৃষ্টিতে প্রকট হয়। উহার উদ্দেশ্য এই যে,—প্রকট ব্রজলীলা অনুশীলনে মানুষ মাধুর্য্যের আস্বাদ পাইলে, তাহার বহির্ম্মুখ বৃত্তি নিবৃত্তি হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যের প্রকাশ। মানুষ এই কারুণ্যের অধিকারী, এইজন্যই মানুষের স্থান অতি উচ্চে। তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,—

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

ব্রজলীলার আদর্শের দিকে আকৃতি, প্রকৃতি, ব্যবহারাদিতে ক্রমে মানুষের অগ্রসর হওয়া, জগতের ইতিহাস দ্বারা সমর্থন করা যায়।

১৩। "রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ॥"

এই শ্লোকটী প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে উল্লেখিত হইয়াছে; ব্রজ-লীলারও ইহাই মূল। ইহার অনুরূপ মন্ত্র বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায় - চতুর্থ ব্রাহ্মণ—প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র,—"আত্মৈ-বেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ; সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ।"

"স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈ তাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ ; স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাম্।"

প্রথম মন্ত্রটীতে সৃষ্টির অতীতে আত্মারূপে যিনি আছেন, তাঁহাকে 'পুরুষবিধ' বলা হইয়াছে। পুরুষবিধ শব্দের অর্থ শঙ্কর করিয়াছেন, – "হস্তপদাদি সম্পন্ন বিরাট্ স্বরূপ।" এই হস্তপদাদি কখনও প্রাকৃত হস্তপদাদি হইতে পারে না। ইহা বিরাট স্বরূপের অপ্রাকৃত হস্তপদাদি, যাহা হইতে প্রাকৃত হস্তপদাদির অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রাকৃত-রূপের অতীতে নিত্যরূপ থাকা সমর্থিত হয়। এই মন্ত্রে পুরুষবিধ-আত্মার সর্ব্বপ্রথমে 'সোঽহং' এই জ্ঞান হওয়ার উল্লেখ আছে, ইহাই শক্তির প্রথম উন্মেষ। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ইহাই সৎ-শক্তি। তাহার পর দ্বিতীয় মন্ত্রটীতে বলা হইয়াছে যে, সেই পুরুষবিধ শক্তি-বিশিষ্ট আত্মার রমণের ইচ্ছা হইল। এই রমণের ইচ্ছাই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের চিৎশক্তি ও আনন্দশক্তির প্রকাশ। পুরুষবিধ আত্মার এইরূপ রমণ ইচ্ছার ফলে তিনি এমন হইলেন, যেমন আলিঙ্গিত স্ত্রী পুরুষ। কি প্রকারে এমন হইল, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে,—'স ইমম্ আত্মানম্ এব দ্বেধা অপাতয়ৎ।' তাহার ফলে 'পতিঃ চ পত্নী চ অভবতাম্'—অর্থাৎ নিজেই নিজকে ভেদ করিয়া পতি ও পত্নীরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। এই মন্ত্রটীতে যে 'রমণ' শব্দটী আছে, তাহার অর্থ রস আস্বাদন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই রমণ-ইচ্ছাই রাসলীলার কারণ বলিয়া উল্লেখিত আছে। ভগবান্ অপি যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ রন্তুং মনশ্চক্রে।" আত্মকাম

হইয়াও রমণ-ইচ্ছা কি প্রকারে সম্ভবে, তাহার উত্তর ঐ মন্ত্রেই আছে। 'স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ।' শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন,—"বিরাটপুরুষ আপনার স্বরূপটীকে বিমর্দ্দিত করিয়া দ্বিধা হন নাই; নিজেই নিজকে দ্বিধা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরূপ পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল। আপনার অমোঘ-সঙ্কল্পবশে তাঁহা হইতে সমালিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষাকার একটী মূর্ত্তি অভিব্যক্ত হইল। তাহাতে বিরাটপুরুষের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।"

১৪। এই স্ত্রী-পুরুষ-সমালিঙ্গিত অবস্থার ফল বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ—একবিংশতি মন্ত্রে বর্ণিত আছে,—

"তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ংরূপম্। তদ্‌যথা প্রিয়য়াস্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্।"

এই মন্ত্রটী প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে উল্লেখিত হইয়াছে। ব্রজলীলায় মধুর ভাবে যে সমস্ত লীলা আছে, তাহার মূল এই মন্ত্র। ঐ সমস্ত লীলা যে, শক্তিমান্ ও তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহিত লীলা, তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই তিনটী মন্ত্র দ্বারা সমর্থিত হয়।

১৫। ব্রজলীলার মাধুর্য্যের একটী খনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ। ঐ রূপের শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যাহা বর্ণনা আছে,

তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ রূপের বর্ণনা আছে,—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরংপদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥"

এই শ্লোক অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মধ্যলীলা-একবিংশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নর-বপু তাঁহার স্বরূপ ;
গোপবেশ বেণু-কর, নব-কিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন,—
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সব প্রাণী করে আকর্ষণ।
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তা'র শক্তি লোকে দেখাইতে,
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য-লীলা হৈতে। ২।২১।৮৩-৮৫

এই ত্রিপদী কয়টীতে অরূপের রূপ কি প্রকারে হয়, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ইহা ভক্তগণের গূঢ়ধন। ভক্তের নিকট—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—'আনন্দমাত্রৈকরসরূপ' ধারণ করেন। তাহা কিরূপে হয়, ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, "যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি," তাঁহারই শক্তিতে ইহা হয়। এই শক্তি সচ্চিদানন্দস্বরূপে আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তি।

আরও বলা হইয়াছে যে, ইহা মধুর-রূপ। ইহার এক কণা ত্রিভুবন ডুবাইয়া সর্ব্বপ্রাণী আকর্ষণ করে। এই রূপ জগৎকে দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলা করেন।

১৬। শ্রীকৃষ্ণের রূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—মধ্যলীলা—একবিংশ পরিচ্ছেদে আরও বর্ণিত আছে,—

"তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্য সার,
তা'তে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম ;
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
তাহাঁ ডুবায়, না হয় উদ্গম। ২।২১।৯৪

শ্রীকৃষ্ণের তারুণ্যকে অমৃতের সিন্ধু, শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য ঐ সিন্ধুর তরঙ্গ, ঐ লাবণ্যের ভাব-উদ্গমকে তরঙ্গের আবর্ত্ত বলিয়াছেন, বংশীধ্বনিরূপ ঘূর্ণিবায়ু, নারীর মনরূপ তৃণাদি ঐ আবর্ত্তে ডুবাইয়া দেয়। একবার তাহাতে ডুবিলে আর ঐ মন উঠিতে পারে না। ইহাই এই ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে।

"নারীর মন তৃণপাত" কথার ধ্বনি এই যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির প্রকাশরূপা ব্রজ-গোপিনীদের আদর্শ-উন্মুখী প্রাকৃত জগতের সর্ব্বপ্রকার প্রাণী। ঐ আদর্শ উন্মুখী হইলে, প্রাকৃত জগতের প্রাণী মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিরূপ ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের তারুণ্যরূপ পারাবারে লাবণ্য-তরঙ্গের ভাব-আবর্ত্তে পড়িয়া, মাধুর্য্যময় অমৃত-সিন্ধুর আস্বাদ পাইয়া ডুবিয়া যায়। সেই মাধুর্য্য কিরূপ, তাহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিতেছেন,—

মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার
তাহা, শুক—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানা মতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥" ২।২১।৯২

এখানে ভগবত্তার সার মাধুর্য্য বলা হইয়াছে; অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের স্বরূপ—মাধুর্য্য। প্রভু বন্ধুসুন্দরের নিরুপম ভাষায় "কৃষ্ণ নিরুপাধি-মাধুর্য্য-বিগ্রহ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও বলিয়াছেন,—

সেই ত মাধুর্য্যসার অন্যসিদ্ধ নাহি তা'র,
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি;
আর সব প্রকাশে তাঁ'র দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি। ২।২১।৯৮

এই ত্রিপদীর অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যই অন্য সমস্ত মাধুর্য্যের সার অর্থাৎ মূল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য অনন্যসিদ্ধ অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ। সমস্তপ্রকার গুণ অর্থাৎ শক্তির খনি শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য। জগতে যত কিছু প্রকাশ আছে, তাহা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য শক্তিতে ভাসমান হইতেছে। ঐ সমস্ত প্রকাশের ক্রিয়া দ্বারাই ইহা জানা যায়। এক কথায় প্রাকৃত জগতে যে আনন্দ আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যেরই ফল। ব্রজগোপীর সহিত এই মাধুর্য্যের সম্বন্ধ বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

গোপীভাব-দর্পণ নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য;
দোঁহে করি হুড়াহুড়ি, বাঢ়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য। ২।২১।৯৯

পূর্ব্ব ত্রিপদীতে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সমস্তের সার এবং অনন্যসিদ্ধ বলা হইয়াছে। তাহা হইলেও গোপী-ভাব-দর্পণ অর্থাৎ গোপীর প্রেমের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপ ধারণ করে। মাধুর্য্যের নব নব রূপে গোপীভাবও উৎকর্ষতা লাভ করে। প্রেম ও মাধুর্য্যের মধ্যে যেন একটী প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। কেহই কাহাকে হারাইতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় রূপ আস্বাদনের উপায়, গোপীভাব আদর্শ রাখিয়া তাহার অনুশীলন করা। হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশরূপ গোপীপ্রেমের আশ্রয় ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের অন্য পথ নাই।

১৭। শ্রীমদ্ভাগবতে—নবম স্কন্ধে—চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে—পঞ্চ ষষ্ঠী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা আছে,—

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসং।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো-
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে—একত্রিংশ অধ্যায়ে—পঞ্চদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ সম্বন্ধে গোপীগণের উক্তি ;—

"অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষকৃদ্দৃশাম্॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই দুইটী শ্লোক মধ্যলীলা—

একবিংশ পরিচ্ছেদে আস্বাদন করিতে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ "ত্রিজগৎ কৈল কামময়" বলিয়া পরে বলিতেছেন,—

"এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনামূলে বিলায় নিজামৃত ;
কাহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে,
সব লোকে করে আপ্যায়িত।
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যা'র এ দুই নয়ন ;
লাবণ্য-কেলি-সদন, জল নেত্র-রসায়ণ,
সুখময় গোবিন্দ বদন।
যা'র পুণ্য-পুঞ্জ-ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পান ?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দন।
না দিলেক লক্ষ-কোটি, সবে দিলে আঁখি দু'টী,
তাহে দিলে নিমেষ আচ্ছাদনে ;
বিধি-জড়-তপোধন, রসশূন্য তাঁ'র মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে।
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তা'র ক'রে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার ?
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তা'র ক'রে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তা'র।"

২।২১।১০৯—১১৩

ইহার পরেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"মধুরং মধুরং বপুরস্যবিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

ইহা শেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন,— শ্রীকৃষ্ণরূপ—"মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর,
তাহা হইতে অতি-সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক ব্যাপে যা'র পুর॥" ২।২১।১১৭

এই বর্ণনা বৃহদারণ্যক উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে—তৃতীয় ব্রাহ্মণ—ষষ্ঠ শ্লোক—"মধুবাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি মন্ত্রের ঠিক অনুরূপ।

১৮। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরীর ন্যায় তাঁহার বাক্য, স্পর্শ, গন্ধ ও অধররস সমস্তই মাধুর্য্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বিষয়ের রস আস্বাদনের জন্য তদীয় দাস, সখা, পিতামাতা এবং সর্ব্বোপরি কান্তাগণ সর্ব্বদাই লালায়িত। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বিষয়ও ব্রজলীলার সহায়কারী, সমস্ত ব্যক্তিরই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদিত হইবার জন্য লালায়িত। চক্ষু রূপকে, কর্ণ শব্দকে, নাসিকা গন্ধকে, জিহ্বা রসকে, ত্বক্ স্পর্শকে যেমন আকর্ষণ করিতেছে, তেমনি রূপ চক্ষুকে, শব্দ কর্ণকে, গন্ধ নাসিকাকে, রস জিহ্বাকে, স্পর্শ-ত্বক্‌কে আকর্ষণ করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর

শ্রীমতী রাধিকার ভাবে দিব্যোন্মাদ অবস্থার একটী প্রলাপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে :—

"কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস ;
যাঁর মাধুর্য্য কথন না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিকে ধায় ॥
সখিরে শোন মোর দুঃখের কারণ ;—
মোর পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণ মহালম্পট দস্যু-পণ,
সভে করে হরে পরধন ॥
এক অশ্ব একক্ষণে পাঁচ পাঁচ দিকে টানে
একমন কোন্ দিকে যায়।
এককালে সভে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
এই দুঃখ সহনে না যায় ॥" ৩।১৫।১৩—১৫

এই কয়টী ত্রিপদীতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শব্দ, স্পর্শ, সৌরভ ও অধর-রসকে পরধন বলিয়াই মনে হইলেও ইহা সমস্ত পরধন হইতে পারে না। এই মনোভাবে আবার বলা হইতেছে,—

"ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ইহা সভার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।" ৩।১৫।১৬
"কৃষ্ণ-রূপামৃত-সিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
একবিন্দু জগৎ ডুবায় ॥" ৩।১৫।১৭

এই দুইটী ত্রিপদীতে বলা হইল যে, ইন্দ্রিয়গণ যে কৃষ্ণরূপাদি মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে চাহে, তাহাতে তাহাদের কোন দোষ নাই। কৃষ্ণ-রূপাদির মাধুর্য্যই ইন্দ্রিয়দিগকে সর্ব্বদা আকর্ষণ

করিতেছে এবং কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধুর তরঙ্গের একবিন্দু জগৎ ডুবাইয়া রাখিয়াছে। এই বর্ণনা কবিত্বাংশে যেরূপ মধুর তত্ত্বাংশেও সেইরূপ উপযোগী।

১৯। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, স্পর্শ, রস, শব্দ ও গন্ধ কিরূপে শ্রীমতী রাধার চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা, কর্ণ ও নাসিকাকে আকর্ষণ করে, তাহা গোবিন্দলীলামৃত নাটকের কয়েকটী শ্লোক—যাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের যথাক্রমে ৩।১৫।৮, ৩।১৫।১০, ৩।১৬।১০, ৩।১৭।৩ ও ৩।১৯।৬ শ্লোক, তাহাতে বর্ণিত আছে। গোবিন্দলীলামৃত নাটকে উল্লেখিত শ্লোকগুলি স্বীয় সখীর প্রতি শ্রীমতী রাধার উক্তি। শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন,—'স মে মদনমোহন সখি তনোতি', অর্থাৎ সখি, আমার সেই মদনমোহন আমার স্পৃহা বর্দ্ধন করিয়াছেন,—কিসের স্পৃহা,—নেত্র, ত্বক্, জিহ্বা, কর্ণ ও নাসার। ঐ সমস্ত শ্লোকে মদনমোহনের যে সমস্ত বিশেষণ দেওয়া আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহন রূপ, স্পর্শ, রস, শব্দ ও গন্ধের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের বর্ণনা আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় রাধা ভাবে ঐ সমস্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত আছে; তাহা নিম্নের কয়েকটী ত্রিপদীতে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের ঐ রূপাদি বিষয়ের মাধুর্য্য জগৎ ব্যাপিয়া আছে এবং যখন যে বিষয়টীর মাধুর্য্য স্ফুরণ হয়, তখন অন্য সমস্ত বিষয় বোধ হয় লোপ হয়। ব্রহ্মের সৃষ্টিতে রসাস্বাদন ও বিস্তারের ইচ্ছাই মূর্ত্ত প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তানন্দৈকরসমূর্ত্তি।" শ্রীকৃষ্ণের রূপকে 'অদ্ভুত······বলিয়া' তাহা—

"লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,"—বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শকে 'কোটিচন্দ্র-সুশীতল' বলিয়া—

"একবার যা'রে স্পর্শে, স্মরজ্বালা-বিষ নাশে,"—বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসকে বলা হইয়াছে,—

"তনু মন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥"

শ্রীকৃষ্ণের বেণু ঐ অধর-রস পান করিয়া, ঐ রসের বল নিজ স্বরে সঞ্চার করতঃ—'আকর্ষয়ে ত্রিজগতের জন।'
শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের গম্ভীর ধ্বনি—

"তা'র এক শ্রুতি-কণে, ডুবে জগতের কানে
পুন কান বাহুড়ি না আয়॥"
"সে শ্রীমুখভাষিত অমৃত হইতে পরামৃত
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত॥"

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ—

"ব্যাপে চৌদ্দভুবনে করে সর্ব্ব আকর্ষণে" বলিয়া উহাকে আবার বলা হইয়াছে—

"মদনমোহনের নাট পসারি-গন্ধের-হাট
জগন্নারী-গ্রাহক লোভায়।
বিনি মূলে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়ে করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥"

এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, জগতে যতপ্রকার করণ-পদার্থ আছে, তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি-রূপা শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতেছেন। ঐ মাধুর্য্য "**অনন্তানন্তময়**।"

২০। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ অনুভব করিয়া, তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদনের চেষ্টা করে। এই অনুভব ও চেষ্টা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রকমের। নিদ্রা, মোহ বা মৃত্যুতে এই অনুভব প্রত্যেক মানুষের লোপ হইতে দেখা যায় বটে ; যে-চিচ্ছক্তির প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের, এই আস্বাদ সম্ভব হয়, সেই শক্তির কখনও লোপ হইতে পারে না ; কারণ সেই চিচ্ছক্তির লোপ হইলে জগতে কাহারও মাধুর্য্য আস্বাদ থাকিতে পারে না বা ভবিষ্যতেও হইতে পারে না।

ব্যক্তি বিশেষের মাধুর্য্য আস্বাদ লোপ হইলেও অন্য ব্যক্তির মাধুর্য্য আস্বাদ থাকায় এবং ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির মাধুর্য্য আস্বাদনের ক্ষমতা থাকায় ব্যক্তি বিশেষ-নিরপেক্ষ নির্ব্যক্তিক মাধুর্য্য শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। ব্যক্তিগত মাধুর্য্য আস্বাদে—মূলে যে ঐ নির্ব্যক্তিক স্থায়ী মাধুর্য্যশক্তি আছে, তাহাতে ব্যক্তি বিশেষের বিষয়েন্দ্রিয় অনুভব যোগ হইলে, সেই ব্যক্তির মাধুর্য্য আস্বাদ হইয়া থাকে। মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে যখন যে পরিমাণ ঐ মাধুর্য্য-শক্তির সহিত যুক্ত হইতে পারে, তখন সেই পরিমাণ মাধুর্য্যের আস্বাদ পায়। এই আস্বাদনের কারণ,—মানুষের ব্যক্তিগত পৃথক্ পৃথক্ বিষয়েন্দ্রিয়ের

যোগ নহে। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বোধ মানুষ সেই পরিমাণই করিতে পারে, যে পরিমাণ সে চির-সুন্দর ও চির-মধুরের সহিত মিলিত হইতে পারে। এই মিলনে সে অনুভব করে যে, বিষয়-ইন্দ্রিয় তাহার নহে। তাহাদের ভিতর দিয়া চির-সুন্দর ও চির-মধুর নিজেই নিজের রস আস্বাদন করিতেছে। এই তত্ত্ব তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টম মন্ত্রে যে বিষয়যুক্ত লৌকিক আনন্দ এবং নির্ব্বিষয়ক ব্রহ্মানন্দের আলোচনা আছে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ডে যে উদ্গীথ ভক্তি ও মুখ্য-প্রাণের শাঙ্কর-ভাষ্য আছে, তাহার দ্বারা সমর্থিত হয়।

২১। অরূপের রূপ, নির্গুণের গুণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় বিহীনের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য, উপনিষদ্ দ্বারা সমর্থন করা হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ—প্রথম মন্ত্র,—

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ সচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ॥"

ইহার অর্থ—অরূপ রূপ ধরিতে পারেন, অমৃত মর্ত্ত্য হইতে পারেন, গতি-হীন গতি-শীল হইতে পারেন, পরোক্ষ বিদ্যমান্ হইতে পারেন।

অনুরূপ ভাবের মন্ত্র ঈশ, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,—

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥"

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ঈশ—৪-৫।
"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥" কঠ—২।২১।
"অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেম্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥" কঠ—১।২।২২
"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥" শ্বেতঃ—৩।১৬।১৭
"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" শ্বেতঃ—৩।১৯

এই সমস্ত মন্ত্রে যে নিরবচ্ছিন্ন নির্বিবশেষ ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারার উল্লেখ আছে, তাহার কারণ 'কেন' উপনিষদে আছে,—

"যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।" কেন—১।৫
"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।" „ —১।৬
"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।" „ —১।৭
"যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।"
কেন—১।৮
"যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।" কেন—১।৯

এই পাঁচটী মন্ত্রে দ্বিতীয় চরণে আছে,—

"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি"।

ইহার অর্থ এই ;—তিনি ব্রহ্ম এবং তাঁহাকেই জান—যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হ'ন না, পরন্তু যাঁহার সাহায্যে বাক্য উচ্চারিত হয় ; যাঁহাকে মন দ্বারা চিন্তা করা যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা মন চিন্তা করে ; যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা চক্ষু দেখে ; যাঁহাকে কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা কর্ণ শ্রবণ করে ; যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ করা যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঘ্রাণ গ্রহণ করে।

যাহার দ্বারা ব্রহ্ম সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চালনা করিতেছেন, তাহাই ব্রহ্মের শক্তি ; এ বিষয়ে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। যিনি সমস্ত চালনা করিতেছেন, তিনি যে ঐ সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আধার ও আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা বলাই বাহুল্য। মানুষ ব্রহ্মকে তাহার প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় করিতে পারে না ; কিন্তু তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মূল কারণ যে ব্রহ্ম, তাহা অনুভব করিতে পারে।

২২। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং মৈথুন, ইহা সমস্তই আত্মা হইতে উদ্ভূত। তাহা 'কঠ' উপনিষদের চতুর্থ বল্লীর তৃতীয় শ্লোকে আছে,—

"যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ। ৪।৩

এই শ্লোকের 'যেন এতেন' শব্দের অর্থ—'যে এই আত্মার দ্বারা', অর্থাৎ যিনি জানেন যে এই আত্মা দ্বারাই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং মৈথুন (মিলন জনিত সুখ অনুভব) হইয়া

থাকে, তাঁহার আর কিছু জানিবার বাকি থাকে না। 'নচিকেতার' জিজ্ঞাসিত আত্মা ইহাই। 'ঐতরেয় উপনিষদে' আত্মা হইতে সৃষ্টি হওয়া এবং ঐ সৃষ্টিতে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ দ্বারা ব্রহ্মের নিজেই নিজের আনন্দ আস্বাদন করা, পূর্ব্বে প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে উল্লেখ হইয়াছে। ইহার দ্বারা বর্ত্তমান্ বিষয় সমর্থিত হয়। সর্ব্বোপরি 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' 'ভূমা' বলিয়া যে তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহার দ্বারাও যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শক্তিমান্ এবং শক্তিভেদে নিজেই নিজের আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন, তাহা সমর্থিত হয়।

'ছান্দোগ্য উপনিষদে' সপ্তম অধ্যায়—নারদ সনৎকুমার সংবাদে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ আলোচনা অন্তে ত্রয়োবিংশ খণ্ডে আছে'—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং।" এই ভূমা কি তাহা চতুর্বিংশ খণ্ডে আছে,—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি স ভূমা,
অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্,
যো বৈ ভূমা তদমৃতামথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্
প্রতিষ্ঠিত-ইতি, স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি।"

এই মন্ত্রদ্বয়ে ভূমাকে সুখ ও অমৃত এবং তাহার তুলনায় অল্পকে মর্ত্ত্য ও সুখহীন বলা হইয়াছে। কেন এইরূপ ভূমা ও অল্প বিপরীতভাবাপন্ন, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে, যে, ভূমাতে দৃশ্য, শ্রোতব্য, জ্ঞাতব্য আত্মা হইতে অন্য নহে অর্থাৎ আত্মা যাহা দেখেন, শোনেন বা জানেন তাহা আত্মাই। অল্পতে

দৃশ্য, শ্রোতব্য ও জ্ঞাতব্য, আত্মা হইতে পৃথক করিয়া অনুভব হয়।

এখানে যে মাত্র দেখা শুনা ও জানা উল্লেখ আছে, তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই তুলনা দ্বৈতভাবাপন্ন সমস্ত ব্যাপারে প্রযোজ্য। ভূমা তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে শঙ্কর বলিয়াছেন,—'ভূমা' অর্থ মহৎ, নিরতিশয় ও বহু। 'ভূমা' অপেক্ষা নিম্নতম পদার্থ 'অল্প'—সাতিশয়। অল্পের তারতম্য আছে। এই তারতম্য বা ভেদই দুঃখের মূল। যাহা পাইলে আর কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহাই ভূমা।

এই মন্ত্রে আরও আছে যে, 'ভূমা' নিজেই নিজের মাহাত্ম্যে অর্থাৎ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু পুনরায় 'ন মহিম্নি' বলায় তাঁহার প্রকট ও অপ্রকট অবস্থা সূচিত হয়। এই 'ভূমা' তত্ত্ব অনুযায়ী ব্রজলীলার সমস্ত পার্ষদের চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌রূপ আশ্রয় সমস্তই ভূমারূপী শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ-বিষয়সমূহও ঐ ভূমারই। নিজ নিজ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব অনুযায়ী এই আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পর আস্বাদন হয়। জীবের পক্ষে এই আস্বাদন মায়া-শক্তির প্রভাবে আশ্রয় ও বিষয়ের ভেদজ্ঞানে পৃথক বলিয়া মনে হয়।

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে, এই আশ্রয় ও বিষয় এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। চক্ষুর বৃত্তি ছাড়া রূপ থাকিতে পারে না; আবার রূপ না থাকিলে চক্ষুরও কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না। চক্ষুঃ যেমন রূপের জন্য লালায়িত, রূপও

তেমনি চক্ষুর জন্য লালায়িত। একের উৎকর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যের উৎকর্ষও বৃদ্ধি পায়। এইপ্রকারে অন্যান্য সমস্ত দ্বৈত-ভাবাপন্ন বিষয় ও ব্যাপার পরস্পরের উৎকর্ষ বর্দ্ধন করে, তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি। ১।৪।১২৪

কৃষ্ণমাধুর্য্য ও রাধাপ্রেম তুই যে এক এবং তাহা অসীম, অনন্ত ও পূর্ণ হইয়াও যে ভূমার ন্যায় ক্রমবর্দ্ধনশীল, তাহা এই আলোচনা হইতে বুঝা যায়।

২৩। মাধুর্য্যের প্রকাশ যে সুধু শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের, কর্ণ ত্বক্ আদি ইন্দ্রিয়ের যোগেই হয়, তাহা নহে। পারিবারিক, যথা—পিতা, মাতা ও পুত্র,—স্বামী-স্ত্রী,—ভাই-ভগিনী,—সামাজিক, যথা আত্মীয়-স্বজন,—বন্ধু-বান্ধব,—দাস-প্রভু ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধেও মাধুর্য্য আছে। দ্বৈতভাবাপন্ন এই সব সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের বিষয়-আশ্রয়রূপে নিজ নিজ সম্বন্ধ-মূলক ভাব অনুযায়ী রস আস্বাদন হয়। বিষয়-ইন্দ্রিয় সংযোগ জনিত মাধুর্য্যের যেমন একটা নির্ব্বিষয়ক স্থায়ী সত্তা আছে, তেমনই সম্বন্ধমূলক মাধুর্য্যের রসেরও একটী নির্ব্যক্তিক স্থায়ী ভাব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ আদিপুরুষ। তাঁহার সংবিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী নামক স্বরূপ-শক্তির বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে। সংবিৎ-শক্তির আশ্রয়ে আদি শক্তিমান্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের, তাঁহার নিজ স্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্‌রূপ সত্তার জ্ঞান হয়;

সন্ধিনী-শক্তির আশ্রয়ে মাতা—পিতা—সখা—সেবক ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়-স্বজন এবং শয্যা, আসন, স্থান, গৃহ আদি যাবতীয় বস্তুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেব্য-সেবকরূপ সম্বন্ধ হয়; হ্লাদিনী-শক্তির আশ্রয়ে শ্রীরাধিকাদি কান্তারূপা গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কান্তভাবে রস আস্বাদন করেন। ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা এই সব তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয়,—অন্য উপায় নাই; কিন্তু স্বরূপে এই সব তত্ত্বের কোন ভেদ নাই, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

স্বরূপ তিন শক্তি সমন্বিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রাকৃত জগতের ব্যাপারের মত দেখা গেলেও, জগতের প্রাকৃত ব্যাপার হইতে উহার মূলগত পার্থক্য সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিয়াছেন,—"ইহলোকে বা পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ বই অন্য কেহই পুরুষ নাই। অন্য যাঁহাদিগকে পুরুষ আকারে দেখা যায়, তাহারা সকলেই প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি। গোপীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত। দম্পতির ভাব নয়, দম্পতির ভাব প্রাকৃত মাত্র।" ঐ সমস্ত অপ্রাকৃত ভাবের সহিত প্রাকৃত ব্যাপারের সম্বন্ধ এই যে, অপ্রাকৃত ভাব আছে বলিয়াই, প্রাকৃত সমস্ত ব্যাপার সম্ভব হইতেছে; ইহা মনে রাখিয়া অপ্রাকৃত মাধুর্য্যময় লীলা অনুশীলন করিলে জগতের প্রাকৃত ব্যাপারও সমস্ত মধুময় হয়।

২৪। জাগতিক ব্যাপারে মানুষের অতি নিকট সম্বন্ধ তাহার পারিবারিক ব্যক্তিবর্গের সহিত, যথা—স্বামী-স্ত্রী,—মাতা-পিতা ও সন্তান,—ভ্রাতা-ভগিনী ইত্যাদি। তাহার পরই ক্রমে

দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন, সখা-সখী,—বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ অনেক অংশে সখ্য ভাবের মত। মানবজাতি যতক্ষণ এই সমস্ত সম্বন্ধমূলক প্রীতি ব্যবহার করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা রক্ষা হয়। তাহার ব্যতিক্রম হইলেই অশান্তি ও বিরোধ উদ্ভূত হয়। জাগতিক ব্যাপারে এই সমস্ত প্রীতির ব্যবহারের স্থায়ী রূপ ও আদর্শ—ব্রজলীলা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবে ব্রজে শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরের ব্যবহারই জাগতিক ব্যাপারে স্থায়ী রূপ ও আদর্শ। জাগতিক ব্যবহারের মূল সাধারণতঃ আত্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্যক্তিগত দেহের প্রীতি এবং এই প্রীতির জন্যই অন্য ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ। ব্রজলীলায় আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি নাই, এমন কি, দেহের স্মৃতিও নাই। সেখানকার সম্বন্ধ শক্তিমান্ ও তাহার স্বীয়শক্তির পরস্পরের আকর্ষণ; উহার অন্য কোন কারণ বা উদ্দেশ্য নাই।

যে এক রস, আস্বাদন ও বিস্তারের জন্য বিভিন্ন হইয়াছিল, সেই (বিভিন্ন) রস আবার উন্নততর এক হইবার জন্য লালায়িত। এই লৌল্যই ব্রজের সম্বন্ধের বন্ধন। পিতা-মাতার তাড়ন ও ভর্ৎসন, কান্তার মান-অভিমান, সখার দাবী-আব্দার সমস্তই সে-ই লৌল্যমূলক।

ব্রজের ব্যবহারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য সমস্তই আছে; কিন্তু ইহা নিজ দেহপ্রীতির জন্য নহে। ঐ সমস্ত মনোভাব নিজ দেহের প্রীতির জন্য হইলে, উহা রিপু ও কাম হইয়া পরস্পরের বিরোধ জন্মায়; কিন্তু যখন উহা

লৌল্যমূলক, তখন উহা প্রেমাত্মক আনন্দময় এবং মিত্র। ব্রজভাবে ভাবিত হইতে পারিলে ঐ সমস্ত মনোভাব—মানুষ মিত্ররূপে অনুভব করিয়া আনন্দ পাইতে পারে।

গৌতমীয়তন্ত্রে আছে, "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"—গোপরমণীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কামই প্রেম। প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে যে ব্রহ্মের কামনা, তপস্যা, ঈক্ষণ, বহু হওয়ার ইচ্ছা ও রমণ-ইচ্ছা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাই গোপ-রমণীদের কাম। এই কাম ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের এই ইচ্ছা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সর্ব্বপ্রকার কামনা-বাসনা ও লালসা—প্রেমেরই প্রকাশ। দেহ-প্রীতি-দোষ-বশতঃ উহা বহির্মুখ হইলে প্রাকৃত কামবৎ প্রতীয়মান হয়। দেহ-স্মৃতি ও দেহ-প্রীতি লোপ হইলে, ঐ সমস্ত কামনা-বাসনার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া কৃষ্ণ-উন্মুখ হয় এবং তাহার নাম তখন প্রেম দেওয়া হয়।

২৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে—স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে যখন সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ী স্বামীর অর্জ্জিত বিত্ত ও সম্পত্তির ভাগ না চাহিয়া বলিলেন,—প্রভু! আপনি যাহাকে নিশ্চিতরূপে অমৃতত্ব-সাধন বলিয়া জানেন,—তাহাই আমাকে বলুন। তখন বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দে অধীর হইয়া প্রিয়াকে নিজের অতি সন্নিকটে, প্রায় ক্রোড়োপরি বসাইয়া বলিলেন; "ওহে মৈত্রেয়ি! তুমি পূর্ব্বেও আমার অতি প্রিয়া ছিলে, এখনও আমার মনের মত কথাই বলিয়াছ।" ইহা বলিয়াই ঋষির পতি-পত্নীর প্রীতির উৎস খুলিয়া

গেল। তখন ঋষি যে মন্ত্রটী বলিয়াছিলেন, ঐ মন্ত্রই ব্রজলীলায় মূর্ত্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রটী বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের পঞ্চম মন্ত্র। উহাতে পতি, জায়া, বিত্ত, পুত্র, ব্রহ্ম, ক্ষত্র, কাম, দেব, ভূত, সর্ব্বকাম ইত্যাদি জাগতিক সর্ব্ববিধ ব্যাপার ও বিষয় কেন প্রিয় হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—"আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি; আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

আত্ম-সম্বন্ধ ভিন্ন কিছুই কিছুর প্রিয় হইতে পারে না। এই উক্তি সর্ব্ববাদিসম্মত। আত্মা কি, এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদ্ বলেন, ব্রহ্ম অর্থাৎ ভূমাই আত্মা। এই ভূমা-তত্ত্ব ছান্দোগ্য-উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সংবাদের ভূমা-তত্ত্ব এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী-সংবাদে আত্মতত্ত্ব, ব্রজে ব্রহ্মমোহন-লীলায় মূর্ত্ত হইয়াছে। যথাস্থানে ইহা দেখান হইবে। আত্মসম্বন্ধহীন যে প্রীতি, তাহাই অল্প এবং তাহা দেহপ্রীতিমূলক। এই অল্পেতে প্রীতি ব্রজলীলায় নাই, তাই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রলাপ উক্তিতে চৈতন্যচরিতামৃতকার উল্লেখ করিয়াছেন,—

"বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ-বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥

সখি হে ! শুন মোর হতবিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনু সকল বিফল॥ ২।২।২৬।২৭

যা'তে বংশীধ্বনি সুখ না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটেরে করিয়ে ধারণ॥" ২।২।৪১

২৬। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন লীলা করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই মাধুর্য্যরস আস্বাদন ও বিস্তার করা উদ্দেশ্যে, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ সমস্ত লীলাতে মধ্যে মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণের ঈশিত্ব, বিভুত্ব-আদি ঐশ্বর্য্যশক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, তাহা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যরস বৃদ্ধির জন্য, ইহা বুঝা যায়। ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য্যশক্তির ক্রিয়া—মাধুর্য্য-রসের পুষ্টি করিয়াছে। কয়েকটী লীলা উল্লেখ করিয়া এই তত্ত্ব সমর্থন করা যাইতেছে।

২৭। পূতনা-মোক্ষণ, শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তাসুর-বধ, শ্রীকৃষ্ণের মুখ-বিবরে মা-যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ, শ্রীকৃষ্ণের হামাগুড়ি, উত্থান ও উৎপতন প্রভৃতি বালকসুলভক্রীড়া, গো-পুচ্ছ ধারণ ও আকর্ষণ, প্রতিবাসিনী মাতৃস্থানীয়া গোপীগণের গৃহে বালক-সুলভ দৌরাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ উপলক্ষ্যে তদীয় বদন মধ্যে মা-যশোদার সৃষ্টি-তত্ত্ব দর্শন, উপদ্রুতা মা-যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন, যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভঙ্গকরণ, ফল-বিক্রয়ার্থিনীর নিকট

শ্রীকৃষ্ণের ফল যাজ্ঞা ইত্যাদি লীলা যাহা গোকুলে হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা।

শ্রীকৃষ্ণের ছয় দিন বয়ঃক্রমে পূতনা-মোক্ষণ লীলা হইয়াছিল। পূতনা কংস কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া, মাতৃবেশে হত্যার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের বদনে তাহার বিষাক্ত স্তন অর্পণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ক্ষুদ্র মুখবিবর দ্বারা তাহার স্তন চুষিতে থাকায়, পূতনার মর্ম্মস্থান নিপীড়িত হইয়া নয়নদ্বয় বাহির হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়াই—বিকট কলেবরে শূন্যে উড্ডীয়মানা হইয়া প্রাণত্যাগ করতঃ ভূতলে পতিতা হয়। তখনও শ্রীকৃষ্ণ তাহার বক্ষে নীলকান্তমণিবৎ হাস্যোৎফুল্ল-বদনে বিরাজমান ছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া মাতৃস্থানীয়া যশোদা-আদি গোপীগণ প্রথমতঃ অত্যন্ত শঙ্কাকুল হয়েন, পরে শ্রীকৃষ্ণকে অক্ষত শরীরে পাইয়া, তাঁহাদের পুত্রস্নেহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা পরমহংস শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, পূতনা "জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥" এই সদ্গতির কারণ, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রে পূতনা রাক্ষসী তাহার বিষাক্ত স্তন অর্পণ করায় শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দ্বারা তাহার স্তন্যপানের মাধুর্য্য আস্বাদে—তাহার ভিতরে বাৎসল্যের উদয় হয় এবং সে জননী-গতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদ্বারা পূতনার ভীষণ হিংসা, মাধুর্য্য-আস্বাদে প্রীতি ও ভালবাসায় পর্য্যবসিত হইতে দেখা যায়।

২৮। শকট-ভঞ্জন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের রক্তোৎপলবৎ ক্ষুদ্র-পদ-

আঘাতে বিরাট শকট উল্টাইয়া গেল বটে, কিন্তু সেই পদ দুইটী সমভাবেই রহিল। ব্রজ-বালকগণ, যাহারা ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছিল, তাহারা সকলেই উহা দেখিয়া মা-যশোদার নিকট বলে; কিন্তু তাহাতে মা-যশোদার বাৎসল্যভাবের এই ঐশ্বর্য্য শ্রবণে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। এইরূপ তৃণাবর্ত্তাসুর বধ এবং অন্যান্য ঐশ্বর্য্যের ক্রিয়া দেখিয়াও মা-যশোদার পুত্র-স্নেহ বর্দ্ধিত হওয়া ভিন্ন সঙ্কুচিত হয় নাই। ইহাই ব্রজলীলার বিশেষত্ব।

২৯। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলা এবং ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য গর্গাচার্য্য আভাষে বলিয়া, শেষ কথা বলিয়াছিলেন, তোমার এই পুত্র "নারায়ণ-সমগুণ," অতএব ইহাকে সাবধানে লালন করিবে। এই বাক্যে নন্দ ও যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-প্রেম বৃদ্ধি পায়। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার বালক-সুলভ মধুর-লীলা করিয়া মা-যশোদার ও মাতৃস্থানীয়া অন্যান্য গোপীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কখনও বা কাদা-মাটী মাখান গায়ে—চরণ ও কটিভূষণের ধ্বনি করিয়া—হামাগুড়ি দিয়া বক্র-গমন, কখনও বা মুগ্ধবৎ কোন গোপরমণীর পশ্চাতে কিছু দূর গমনপূর্ব্বক তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলে, ভীতভাবে মা-যশোদার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন, কখনও বা গোবৎসের পুচ্ছ ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে মৃত্তিকায় পতন ও গড়াগড়ি; এইভাবে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া বাৎসল্যরস বৃদ্ধি করিতেন।

৩০। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ হাঁটিতে আরম্ভ করিলে, সমবয়স্ক গোপ-বালক-সহ প্রতিবাসী গোপীদের গৃহে গিয়া

নানাপ্রকার খেলা করিতেন এবং দৌরাত্ম্যও করিতেন। তাহাতে গোপীগণের বাৎসল্যজড়িত যে রোষের ভাব প্রকাশ পাইত, ইহাতে বাৎসল্য-লীলার মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইত।

একদিন নিজ গৃহে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ দৌরাত্ম্যে মা-যশোদা অধৈর্য্য হইয়া, রোষে শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধনের চেষ্টা করেন। ব্রজের সমস্ত রজ্জু একত্র করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের অতি ক্ষীণ কটি যখন বেষ্টন করা গেল না, তখন মা-যশোদার মনে বাৎসল্যের ভাব উদয় হওয়া মাত্রই কটি বেষ্টন হইল। রোষে যাহা সম্ভব হয় নাই, বাৎসল্যে তাহা ঘটিল। ইহা লক্ষ্য করার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতকার দশম-স্কন্ধে, নবম অধ্যায়ে বিংশ ও একবিংশ দুইটী শ্লোক রচনা করিয়াছেন।—

"নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥"

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উদূখলে বদ্ধাবস্থায় গৃহ-প্রাঙ্গণে-স্থিত বৃহৎ যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন করতঃ উদূখল আকর্ষণ করায়, ঐ বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন হয় এবং বৃক্ষরূপী কুবের পুত্রদ্বয় দেবর্ষি-নারদশাপমুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করে। এই সমস্ত ঘটনায় ব্রজবাসী গোপগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-মিশ্রিত অনির্ব্বচনীয় একটী ভাবের উদয় হইয়া ক্রমেই শ্রীকৃষ্ণে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে থাকেন।

৩১। ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত মাধুর্য্যের চূড়ান্ত প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের মুখবিবরে মা-যশোদার একবার বিশ্বরূপ ও অন্যান্যবার প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব দর্শনে। প্রথমবার শ্রীকৃষ্ণ যখন অতি শিশু, তখন মা-যশোদার স্তন পান করিতে করিতে জৃম্ভণ করিলে, তাঁহার মুখ-বিবরে আকাশ স্বর্গ পৃথিবী, জ্যোতিশ্চন্দ্র, দশদিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সপ্তসিন্ধু, সপ্তদ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতময় বিশ্ব, মা যশোদা দেখিয়া কম্পিত-কলেবরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় মা যশোদার যে কি মনোভাব হইয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতকার ব্যক্ত করেন নাই। উহা লীলাশ্রবণ বা পাঠকারী ব্যক্তিগণের নিজ নিজ ভাব-অনুযায়ী অনুমান করিতে হইবে। নিজ শিশুসন্তানের এইরূপ ঐশ্বর্য্য দেখিলে মাতার মনে বাৎসল্যরস উথলিয়া উঠাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়বারে শ্রীকৃষ্ণ হাঁটিতে আরম্ভ করিলে অন্য বালকদের সহিত খেলার সময় নিজের মুখবিবরে মাটি দিয়াছিলেন। মা তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিলে তিনি মাটি খাই নাই বলিয়া মুখব্যাদান করেন। এবার মা যশোদা মুখ-বিবরে প্রাকৃত সৃষ্টি স্থিতি লয়ের সমস্ত শক্তি ও গুণ এবং অপ্রাকৃত সমস্তভাব, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ সহ নিজেকেও দেখিতে পাইলেন। ইহাতে মা যশোদার মনে সম্ভ্রমাত্মক বিবেকভাব উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হইতেই পুত্র স্নেহময়ীর বাৎসল্যভাব ঐ সম্ভ্রমাত্মক বিবেককে ডুবাইয়া দিয়া মা যশোদাকে বাৎসল্যরসে ভাসাইয়াছিল। বাৎসল্য প্রেম এইরূপে দুইবার বিশ্বরূপ দেখার

পর কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরবর্ত্তী ব্যবহারে প্রকাশ পায়।

শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও গোপীদের নিকট লাড্ডু পাওয়ার লোভে নানাপ্রকার ভঙ্গি-করতঃ নৃত্য করিতেন। কখনও বা মুগ্ধ হইয়া সুমধুর গান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার দ্বারা পীঠ পাদুকাদি বহন করাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন জনৈকা ফল-বিক্রেত্রীর 'ফল কিনিবে গো' ডাক শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ক্ষুদ্র অঞ্জলি ভরিয়া ধান্য লইয়া তাহার বিনিময়ে ফল আনিতে যাইবার সময় তাঁহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলীর ভিতর দিয়া সমস্ত ধান পড়িয়া গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া ফল-বিক্রয়িণীর দিকে চাহিতেই ফলবিক্রয়িণী মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চাঁদমুখ চুম্বন-করতঃ হাত ভরিয়া ফল দিয়া ব্রহ্মানন্দের অধিক আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতকার বাল্যলীলা উপসংহার করিয়া বলিয়াছেন—

"দর্শয়ং স্তদ্‌বিদাং লোক আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্।
ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ।"

ভাগবত—১০।১১।৯

ইহার অর্থ, জগতে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য মাত্রই জানেন, মাধুর্য্যের অনুসন্ধান জানেন না, তাঁহাদের নিকট ভৃত্যবশ্যতা অর্থাৎ বাৎসল্য প্রেমের প্রভাব দেখাইবার জন্য ভগবান্ নানাবিধ বাল্যলীলা করিয়া ব্রজবাসিগণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশে ভগবত্তার সার যে মাধুর্য্য, তাহা এই লীলা-অনুশীলনে বেশ অনুভব করা যায়।

দামবন্ধন লীলার পরই নন্দমহারাজ সমস্ত গোপ গোপী এবং গোধনাদি লইয়া গোকুল পরিত্যাগ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে বাস আরম্ভ করেন। গোকুল পরিত্যাগের সময় শ্রীকৃষ্ণের কৌমার বয়স। শ্রীবৃন্দাবনে প্রথমতঃ সখ্যভাবের গোষ্ঠলীলা শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সকালে ব্রজরাখালগণ সহ ধেনু বৎস লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে বাহির হইতেন। যমুনা পুলিনে ফল-শোভিত বনে তাঁহারা নানাপ্রকার খেলা করিতেন ও গোধন রক্ষা করিতেন। অপরাহ্ণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। গোষ্ঠে যে সমস্ত খেলা করিতেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের প্রভুপাদ শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহা দেওয়া যাইতেছে।

"কেহ বা বেণুবাদন করেন, কেহ বা শিঙা বাদ্য করেন, কেহ ভ্রমরের মত গুণগুণ রব করেন, কেহ বা কোকিলের মত কুহু কুহু রব করেন, কেহ বা আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীর ভূমিতে পতিত সচল ছায়ার সহিত দৌড়াইয়া যান, কেহ বা হংসের গতি অনুকরণ করেন, কেহ বা জলের ধারে বকের মত বসিয়া থাকেন, কেহ বা ময়ূরের সহিত নৃত্য করেন, কেহ বা ভেকের সহিত গিয়া তাহার মত লাফ দিয়া ক্ষুদ্র জলধারা পার হন, কেহ বা নিজের প্রতিবিম্বের সহিত হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া নানা রঙ্গ করেন, কেহ বা নিজ প্রতিধ্বনির সহিত চীৎকার করেন। এইভাবে জ্ঞানী ও যোগিগণ যাঁহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ বলিয়া থাকেন, দাসাদি ভক্তগণ যাঁহাকে পরমপুরুষ পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সামান্য বালক মাত্র

বলিয়া থাকেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই অগণ্য পুণ্য-নিকেতন, গোপ বালকগণ, নানাবিধ বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥”

ব্রজরাখালগণের ভাগ্যের সহিত যোগিদের ভাগ্য তুলনা করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী নিম্নের শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন,—

‘যৎপাদপাংসু র্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভি র্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব .যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্।

ভাগবত ১০।১২।১২

এই শ্লোকে ব্রজলীলার বিশেষত্ব যে ভগবদ্মাধুর্য্য-আস্বাদ এবং তাহা যে সর্ব্বপ্রকার সাধন-ভজনজনিত আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দজনক, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা দেখাইয়াছেন।

৩২। গোষ্ঠবিহারকালীন যে যে লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে, তাহার মধ্যে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত ব্রহ্মমোহন লীলাটি বিশেষ লক্ষণীয়। পূতনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘাসুর অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তাহাকে বধ করার পর সমস্ত দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করতঃ তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করে। অঘাসুর বধ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে আসিয়া পূর্ব্ববৎ গোষ্ঠবিহার করিতে থাকেন। ব্রজরাখালগণ যমুনাপুলিনে বিকসিত-কমলাবলী-সুশোভিত জলাশয়ের নিকটে ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিজ নিজ ভোজ্য দ্রব্যের আস্বাদন করাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠবিহার রসে মত্ত হইয়া দক্ষিণহস্তে দধিমাখা অন্নের গ্রাস এবং বামহস্তে নানাবিধ ফল লইয়া

গোপবালকমণ্ডলীর মধ্যস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক নানাপ্রকার পরিহাস বাক্যে গোপবালকগণকে হাসাইতে হাসাইতে ভোজন করিতে লাগিলেন।

অঘাসুর-বধের সময় যে সমস্ত দেবগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা দেখিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা মনে করিলেন যে, যাহাকে আমি অসুর বধার্থে সমস্ত দেবগণসহ তপস্যা করিয়া জগতে আবির্ভাব করাইয়াছি, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ সেই ভগবান কি এই শ্রীকৃষ্ণ ? তাহা হইলে তিনি কিরূপে সাধারণ বালকের ন্যায় এই গোপ বালকগণের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন ! এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ব্রহ্মা প্রথমতঃ, যাহারা ব্রজরাখাল-গণ বনভোজন করিবার সময় কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়াছিল, সেই ধেনুবৎসগণকে হরণ করেন। ব্রজরাখালগণ ধেনুবৎস না দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ধেনুবৎসের অনুসন্ধানে গমন করেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা ব্রজরাখালগণকেও হরণ করিয়া লইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসগণকে বনে বনে খুঁজিয়া দেখিতে না পাওয়ায় যমুনাপুলিনে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু সেখানে গোপবালকগণকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি তাহাদের অন্বেষণে বনে বনে ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির প্রকাশ হওয়ায় ব্রহ্মার কীর্ত্তি বুঝিতে পারিলেন।

৩৩। তখন শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য-প্রেমবতী গোপীগণের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ ও ব্রহ্মার মোহ দূরীকরণজন্য স্বয়ং গোবৎস ও গোপ-

বালকরূপ ধারণ করিলেন। গোপবালকগণ ও গোবৎসগণ যে যে রকম ক্ষুদ্র কলেবর ছিল, তাহাদের যেমন করচরণাদি, যে যষ্টি, শিঙ্গা, বেণু, শিক্য প্রভৃতি ছিল, যেমন বসন ভূষণাদি ছিল, যেমন স্বভাব যেমন গুণ, নাম ও আকৃতি ছিল, তাহাদের যেমন বিহারাদি ও পিতামাতা প্রভৃতির সহিত ব্যবহার ছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই সর্ব্বস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া গোষ্ঠলীলা-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ।"
১০।১৩।১৯

অর্থাৎ এই লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' শ্রুতি বাক্যের মূর্ত্তিমান্ অর্থ প্রদর্শন করাইলেন। তদনন্তর গোপবালক এবং গোবৎসাদি-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে গোপবালকগণ দ্বারা আত্মস্বরূপ গোবৎসগণকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইয়া আত্মস্বরূপ বেণুবাদনাদি ক্রিয়া করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ পৃথক পৃথক গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর ব্রজগোপীগণের নিজ নিজ সন্তানের প্রতি পূর্ব্বে যে বাৎসল্য স্নেহ ছিল, এবং ধেনুগণের নিজ নিজ বৎসের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল, তাহা সমস্ত অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাইয়া এক অত্যাশ্চর্য্য অবস্থায় পরিণত হইল। এইরূপে গোপালরূপী স্বয়ং ভগবান্ গোবৎস ও গোবালকরূপে নিজেই নিজকে পালন এবং নিজের সঙ্গে নিজে নানাবিধ বাল্যক্রীড়া কৌতুকে এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরিশেষে উহা এরূপ অবস্থায় পরিণত হইল যে

শ্রীবলরামও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসরূপে অবস্থিত।

৩৪। ব্রহ্মা গোবৎসগণ ও ব্রজবালকগণকে অপহরণ করার নিজ পরিমাণে অত্যল্পকাল মধ্যে ব্রজে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক ও গোবৎসগণ সহ পূর্ব্ববৎ গোষ্ঠলীলা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অপহৃত গোপবালক স্ব স্ব গোবৎসগণ সহ তিনি যেরূপ মায়ানিদ্রায় গিরি গহ্বরে শায়িত রাখিয়াছিলেন, সেইরূপেই আছে এবং কিয়দ্দূরে কৃষ্ণের সহিত সেই সমস্ত গোপ-বালক ও গোবৎসগণ ক্রীড়া করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়ারত গোপবালক ও গোবৎসগণ কোথা হইতে আসিল, ব্রহ্মা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিজেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এইরূপে মুগ্ধ অবস্থায় নয়ন ফিরাইতেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ঐ সমস্ত গোপবালক ও গোবৎসগণ নব-নীল-নীরদবর্ণ, পীত-পট্টাম্বর-ধারী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মকর, মণি-মুকুট-হার-কুণ্ডল-বনমালা-পরিশোভিত, চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাহাদের উপাসনা করিতেছেন। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, মায়া-বিদ্যাদি বিবিধ শক্তি, ও প্রকৃতি-মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিবংশতি তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, নিজ নিজ সেবা করিবার জন্য তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম, গুণ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাহাদের সেবা করিতেছেন। তৎপরেই ব্রহ্মা যাহা দেখিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতকার বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—

"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্ট-ভূরি-মাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্॥"
ভাগবত ১০।১৩।৫৪

অর্থাৎ ব্রজের গো, গোপাল এবং তাহাদের বসনভূষণ, বেত্র, শিঙ্গা আদি সমস্তই সত্যজ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত আনন্দ, এক রসের মূর্ত্তি। উপনিষদই যাহাদের দৃষ্টি, তাদৃশ জ্ঞান-মাত্র দ্বারা এই ভূরি মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট রূপ অস্পৃষ্ট বা দর্শনের অযোগ্য।

৩৫। এইরূপ দেখিয়া ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। উহার অষ্টাদশ শ্লোকে ব্রহ্মা বলিতেছেন—"আপনার গোবৎস ও গোপবালক-গণকে স্থানান্তরিত করার পর আপনাকে প্রথমতঃ একাকী দেখিলাম। তাহার পরে আপনাকে অনন্ত গোপবালক ও গোবৎসরূপে দেখিলাম। তাহার পর সকলেই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ববস্তু এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত চতুর্ভুজ-রূপে দেখিলাম এবং যত চতুর্ভুজমূর্ত্তি ততগুলি ব্রহ্মাণ্ড দেখিলাম। তাহার পর আবার আপনাকে অদ্বয় অপরিচ্ছিন্ন নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে দেখিতেছি। চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ শ্লোকে ব্রহ্মা বলিতেছেন যে, আপনাকে তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে এইভাবে যে ধারণা করিতে পারে, তাহার মোহ দূরীভূত হয়। যেমন অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হইলে নানাপ্রকার ভ্রম-দৃষ্টি হইতে থাকে, এবং সেই ভ্রম দূর হইলে প্রকৃত স্বরূপের অনুভব হয়, সেইরূপ যাহারা আপনার স্বরূপ ভুলিয়া কেবলমাত্র আত্মানুসন্ধানেই মত্ত থাকে,

আপনার স্বরূপজ্ঞান স্ফূর্ত্তি হইলে তাহাদের তাহা দূর হয়। তাহার পরেই ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

ভাগবত ১০।১৪।৩২

অনন্তর ব্রহ্মা বলিতেছেন, 'হে কৃষ্ণ, তুমি যাঁহাদের জীবন-স্বরূপ, সে ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে কোনও একজনের চরণধূলি-কণিকা যে জন্মে লাভ করা যাইতে পারে, সেই জন্মই ব্রহ্মা-জন্ম অপেক্ষাও সৌভাগ্যজনক বলিয়া মনে করি।' এই উক্তিদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা জানাইতেছেন যে, প্রাকৃত সৃষ্টির অতীতে যে মাধুর্য্যের খনি আছে, তাহারই একবিন্দু পাইবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তাও লালায়িত।

৩৬। ছান্দোগ্য-উপনিষদে তৃতীয়-অধ্যায় চতুর্দ্দশ-খণ্ডে প্রথম মন্ত্র ঃ—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত।"

এবং উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে সুখ ও ভূমা বিষয়ে সপ্তম-অধ্যায়ের দ্বাবিংশখণ্ডের প্রথম মন্ত্র ও ত্রয়োবিংশ-খণ্ডের প্রথম মন্ত্র ও চতুর্ব্বিংশ-খণ্ডের প্রথম মন্ত্র এবং বৃহদারণ্যক-উপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে যে আত্মার সম্বন্ধেই পতি-পুত্রাদি সমস্ত প্রিয় হয়, তদ্বিষয়ে দ্বিতীয়-অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ পঞ্চম মন্ত্রে এই ব্রহ্ম মোহনলীলায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই সমস্ত মন্ত্র পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, এজন্য এখানে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৩৭। ব্রহ্মমোহনলীলা বর্ণনার শেষে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নে শ্রীশুকদেব গোস্বামী মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে উল্লিখিত আত্মার স্বরূপ বিষয়ে ক্রম বিস্তার করিয়া একটি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। ঐ সংবাদে-উল্লিখিত আত্মা অর্থ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ দেহাত্মবাদিদের কথা বলিতেছেন ঃ—

'দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তম্॥'

ভাগবত ১০।১৪।৫২

জাগতিক লোকের সাধারণতঃ দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্ব বা উপলব্ধি নাই, তাহাদের নিকট যে সমস্ত বিষয় দেহেন্দ্রিয়ের সুখ দেয়, তাহাই প্রিয়। ইহার পর, যাহারা প্রাণকেই আত্মারূপে মনে করেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন যে, তাহাদের দেহ জরা জীর্ণ ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সুখ ভোগের অযোগ্য হইলেও তাহাদের বাঁচিয়া থাকার যে ইচ্ছা, ঐ ইচ্ছাতেই সমস্ত বস্তু প্রিয় হয়। ইহা বলিয়াই শ্রীশুকদেব গোস্বামী দেহ ও প্রাণের অতীত যে আত্মা তাহার কথা বলিতেছেন ঃ—

'তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥'
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥
বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥ ১০।১৪।৫৪-৫৬

এই তিনটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "অখিলাত্মনাম্ আত্মা" বলিয়া তিনি 'জগদ্ধিতায়, মায়য়া' অর্থাৎ যোগমায়া শক্তির আশ্রয়ে দেহ ধারণ করিয়াছেন, বলা হইয়াছে; ইহাই অবতার। এই যে দেহধারী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সমস্ত আত্মারই প্রিয়। সকলকেই আকর্ষণ করিতেছেন; তাই ব্রহ্মা যখন ব্রজের সমস্ত গোপবালক গো-গোবৎস হরণ করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণই যখন ঐ ঐ রূপে ব্রজে বিহার করিতেছিলেন, তখন নিজ নিজ সন্তানের প্রতি গোপীগণের এবং নিজ নিজ বৎসের প্রতি গো-গণের যে প্রীতি ছিল, তাহা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এখানে আর একটি লক্ষ্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত গোপ-বালক এবং গো-বৎস ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী-শক্তির প্রকাশ। ঐ শক্তির সহিত স্বয়ং শক্তিমান্ একত্র হওয়ায় উভয়ের মাধুর্য্য অত্যধিক বৃদ্ধি হইবেই। সেইজন্য ঐ মাধুর্য্য-আস্বাদনকারী গোপী ও গো-গণের প্রীতিরও বৃদ্ধি হইয়াছিল।

৩৮। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চ বৎসর বয়সে ব্রহ্মমোহনলীলা হইয়াছিল। তাহার পর বয়োবৃদ্ধি সহকারে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহ নূতন নূতন রকমের খেলা করিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন;—

'এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া
গোপাত্মজত্বং চরিতৈ র্বিড়ম্বয়ন্।
রেমে রমালালিতপাদপল্লবো
গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ। ১০।১৫।১৯

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে গোপাত্মজ, গ্রাম্য ও গ্রাম্যবচ্চেষ্টিত

৭

বলা হইয়াছে। তাঁহার এই ক্রীড়া সাধারণ জাগতিক ব্যক্তি-গণের ন্যায় হইলেও উহা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানেরই লীলা। এইরূপ লীলা করিতে করিতে ধেনুকাসুর বধের পর কালীয়দমন-লীলা হয়। গো ও গোপবালকগণ কালীয় সর্পের বিষদূষিত যমুনাজল পান করিয়া যমুনাতীরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় দৃষ্টিতে চেতনালাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ খেলা করিতে থাকে। ভবিষ্যতে পুনরায় ঐরূপ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ কালীয়-নাগকে দমন করিয়া যমুনাজল বিষমুক্ত করিয়া-ছিলেন। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করেন, তাহাই এখানে দেখান হইবে। তিনি কালীয়-নাগকে কোনপ্রকার অস্ত্রধারণ করিয়া বিনষ্ট করেন নাই। কালীয়-নাগ তাহার ফণা বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে তাহার নাসা-বিবর হইতে বিষ উদ্গারিত হইতে লাগিল, নয়ন জ্বলিতে লাগিল, মুখ জ্বলদঙ্গারের আকৃতি ধারণ করিল; এবং সে একদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বামহস্তে কালীয়ের উন্নত ফণা অবনমিত করিয়া তাহার সুবিস্তৃত মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ নৃত্যগীতাদি-বিশারদ ছিলেন। তিনি কালীয়ের মস্তকোপরি উঠিলে কালীয়ের মস্তকস্থিত রত্নাদির জ্যোতিতে তাঁহার অরুণ চরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে কালীয়ের মস্তকে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, মুনি ও দেববধূগণ পরমানন্দে মৃদঙ্গাদি বাদ্য, গীত ও পুষ্প বর্ষণ করতঃ স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই নৃত্য দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে দমন

করিয়াছিলেন। তাহার পর কালীয়কে দিব্যগতি দিয়া অন্যস্থানে প্রেরণ করেন। ঐ নৃত্যের সময়ে কালীয় নাগের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিল। অতি ভয়ঙ্কর বিষের সহিত ললিত-লাবণ্যামৃতের সংমিশ্রণে এই লীলার মাধুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৯। শ্রীকৃষ্ণের কৌমার বয়সে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকট অন্ন-যাচ্ঞা—এই দুইটি লীলায় শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যরসের বিস্তার করিয়া গতানুগতিকভাবে বিধিনির্দ্দেশ-মূলক প্রচলিত দৈবকার্য্য পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ব্রজবাসী গোপগণ পুরুষানুক্রমে প্রতি বৎসর ইন্দ্রযাগ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে পূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের যখন মাত্র সাত বৎসর বয়স, তখন ঐ যাগের আয়োজন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পিতা নন্দ মহারাজ বলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া শস্যাদি উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা করার জন্য উহার আশায় ইন্দ্রযাগ করা হইবে।

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলেন,— কর্ম্মই সমস্ত ফলপ্রদান করে। কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মফলের নিয়ন্তৃগণ কোনই ফল দিতে পারেন না। সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, ইন্দ্র কাহারও কিছু করিতে পারেন না। যাহার যে কর্ম্ম অনুষ্ঠানে জীবিকনির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার সেই কর্ম্মকেই পরমদেবতাজ্ঞানে পূজা করা উচিত। গোপগণের গো-রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম। গো-চারণ জন্য তাহাদের বন ও পর্ব্বতাদি রক্ষা করিতে হয়। অতএব ব্রজবাসী গোপদের ইন্দ্রযাগের উপকরণ দ্বারা গোচারণস্থান গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এবং গোগণকেই

পূজা করা উচিত। উহাতে সমাগত চণ্ডালাদি সমস্ত অতিথি এবং কুক্কুরাদি সর্ব্বপ্রকার গৃহপালিত পশুগণের ভোজ্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত এবং গোগণকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তৃণ ভোজন করাইয়া ঐ পর্ব্বতকে গন্ধপুষ্পাদি উপচারে পূজা করা হউক। ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য রসে এমনই মুগ্ধ ছিল যে, এই গুরুতর পরিবর্ত্তনে দ্বিধাবোধ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব মতই কার্য্য করিয়াছিল।

ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত দেবরাজ ইন্দ্র ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া ব্রজ-ধ্বংসের জন্য অগণিত বিদ্যুৎ-বিকাশ-অশনিপাত, প্রবল ঝটিকাপ্রবাহ এবং বৃষ্টি ও শিলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের রক্ষার্থে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া, বালক যেমন ছত্র ধারণ করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে বামহস্তে ঐ পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রজবাসিগণ উহার তলদেশস্থিত গহ্বরে আশ্রয় লইয়া দেবরাজের কোপ হইতে অব্যাহতি পায়। সপ্ত-বর্ষীয় বালক শ্রীকৃষ্ণের উর্দ্ধে উত্তোলিত বামহস্তে সুবিশাল গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণরূপ মনোহর মূর্ত্তি অনিমেষ নয়নে দেখিতে দেখিতে ব্রজবাসিগণ বাৎসল্যরসসিন্ধুতে ভাসিতেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ঐরূপ দেখিয়া মাধুর্য্যরসে বিগলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা গ্রহণ করতঃ নিজেকে ধন্য করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের নিম্নের তিনটি শ্লোকে ঐ মাধুর্য্যের বর্ণনা আছে।

'তং প্রেমবেগান্নিভৃতা ব্রজৌকসো
যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ।
গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মুদা
দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ॥ ১০।২৫।২৯

দিবি দেবগণাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণাঃ।
তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব!॥
শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রণোদিতাঃ।
জগু র্গন্ধর্ব্বপতয়স্তুম্বুরুপ্রমুখা নৃপ॥ ১০।২৫।৩১-৩২

উনত্রিংশ শ্লোকে দেখা যায় যে, ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিলেও তাঁহাদের বাৎসল্য ভাব খর্ব্ব হয় নাই। তাঁহারা প্রেমোচ্ছ্বাসে অধীর ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। বাৎসল্যবতী গোপীগণ মাঙ্গল্য দ্রব্য সমর্পণ ও আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহদৃষ্টিতে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। একত্রিংশ ও দ্বাত্রিংশ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, এই লীলা দেখিয়া স্বর্গবাসি-দেবগণ এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব এবং চারণগণ সকলেই মাধুর্য্যে মগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিয়াছিলেন।

৪০। জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণ ঐ মাধুর্য্যের অনুগত হইয়াছিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম-সুবল-আদি সখাগণ সহ গোষ্ঠবিহার কালে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাগারের নিকটস্থ হন। তাঁহারা সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যদিগকে ঐ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া

আনিতে পাঠান। কৃষ্ণ-সখাগণ যজ্ঞাগারে গিয়া যথাবিধি সম্মান-পুরঃসর অন্ন ভিক্ষা চাহিলে মহাড়ম্বরে যজ্ঞানুষ্ঠানে রত বিজ্ঞতাভিমানী ব্রাহ্মণগণ তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। তখন গোপ-বালকগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া সখাগণকে ঐ ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা করিতে পাঠাইলেন। দ্বিজপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদ পূর্ব্বেই পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধাতুর পরমসুন্দর গোপবালকগণ দ্বিজপত্নীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাহিলে দ্বিজপত্নীগণ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন, এবং সর্ব্ববাধা অতিক্রম করিয়া নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসম্॥

ভাগবত—১০।২৩।২২

শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর হাস্যপরিশোভিত মূর্ত্তি ব্রাহ্মণপত্নীগণের ধ্যানের মূর্ত্তি ছিল। এক্ষণে সাক্ষাৎ নয়ন মেলিয়া ঐ মূর্ত্তি দর্শন করতঃ তাঁহারা ঐ রূপ নয়ন দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া সর্ব্বপ্রকার তাপমুক্ত হইয়াছিলেন। দ্বিজপত্নীগণ এই রসময় মূর্ত্তি পশ্চাৎ করিয়া যজ্ঞস্থলে ফিরিতে ইচ্ছুক নহে বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে নিজগৃহে

প্রত্যাবর্ত্তন করান। শ্রীকৃষ্ণ, বয়স্যগণ-সহ, ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ-প্রদত্ত অগণিত অন্নব্যঞ্জনাদি হাস্য-কৌতুক করিতে করিতে পরমানন্দে ভোজন করিয়াছিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য গোপবালক বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা পত্নীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া নিজেদের জাত্যভিমান ও ভক্তিহীনতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিলেন। এই লীলা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতকার দশম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন :—

এবং লীলানরবপুর্ন্নলোকমনুশীলয়ন্।
রেমে গো-গোপ-গোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ॥

ভাগবত—১০।২৩।৩৬

ইহার অর্থ—নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বিবিধ লীলায় নরলোকে প্রেমভক্তি প্রচার এবং রূপ, বাক্য ও বিবিধ আচরণে গো, গোপ ও গোপীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রেমতত্ত্ব-অধ্যায়ে উপনিষদের যে সমস্ত মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়া আলোচিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়।

৪১। শ্রীকৃষ্ণ কিশোর-বয়সে কিশোরী গোপকুমারীদের সহিত যে বিহার করেন, তাহাই মধুর বা কান্তা-ভাবের লীলা। শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত-শ্রবণে ব্রজকুমারীদের পূর্ব্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য ব্রজকুমারীদের কাত্যায়ণী-ব্রত, শেষে বস্ত্রহরণ, এবং তাহার পর শারদীয় রাস-নৃত্য, মধুর ভাবের লীলার অন্তর্গত। মধুর ভাবের লীলার সহিত বংশীবাদনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

আছে। বেণুগীত শুনিয়া গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-মাধুর্য্য আদি স্ফুরিত হইয়া তাহাদের স্মরোদয় হইয়াছিল। প্রথমতঃ গোপীরা ঐ বেণুগীত বর্ণনা করিতে গিয়া এমনই অধৈর্য্য হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বাক্যস্ফুরণ হইতেছিল না ঃ—

তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণ-চেষ্টিতম্।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ! ॥

ভাগবত—১০।২১।৪

তাহার পর কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলে তাঁহাদিগের মানসপটে দেখিতে পাইলেন—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরস্থধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ ॥

ভাগবত—১০।২১।৫

এই শ্লোকে ব্রজগোপীগণের পূর্ব্বরাগ উদয় হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। ইহাতে ভক্ত ও ভগবানের মিলনের তীব্র সেবাকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ বনে যে মধুর বংশীনাদ করিয়াছিলেন, ব্রজগোপীগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে তাহা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ বিবশ হইয়া পড়েন। পরে ঐ বংশীধ্বনি কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলে শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ তাঁহারা অন্তরে দেখিতে পাইলেন। গোবিন্দের এই বংশীনাদে শুধু যে গোপীগণেরই প্রেমোদয় হইয়াছিল, তাহা নহে। উহা শ্রবণে পশু, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গম, দেব দেবী, ইত্যাদি সকলেরই পুলকোদ্গম হয়। ময়ূরগণ

বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে। কৃষ্ণসার হরিণগণ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির প্রতি অবলোকন করিয়া অচল হইয়া থাকে। বিমানচারী দেবীগণ নিজ নিজ পতিক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। গো ও গোবৎসগণ কর্ণ ঊর্দ্ধ করিয়া অশ্রুব্যাপ্তনয়নে নিস্পন্দ হইয়া থাকে। বৃক্ষোপরি পক্ষিগণ অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে থাকে। নদীসকল আবর্ত্ত-সমাকুল এবং বেগহীন হইয়া তরঙ্গ বাহুতে কমল উপহার লইয়া মদনমোহনকে আলিঙ্গন করিতে যায়। মেঘসমূহ বেণুরবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি ছত্র ধরে। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ যখন মধুর অস্ফুটধ্বনি সমন্বিত বেণু বাদন করেন, তখন জঙ্গম প্রাণিগণ নিস্পন্দ হইয়া যায়। স্থাবর প্রাণিগণ পুলকিত হইয়া উঠে। অচেতন পাষাণ গলিয়া যায় এবং মেঘ, নদ, নদীর গতি ভঙ্গ হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মোহন বংশীনাদ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ আলোড়িত করিয়া ত্রিজগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের এই বংশীধ্বনির বর্ণনায় ইহা যে লৌকিক প্রাকৃত বংশীবাদন নয়, তাহা বুঝা যায়। এই বংশীধ্বনি অপ্রাকৃত। সমস্ত তাল, মান, লয়, সঙ্গীতাদির মাধুর্য্যের খনি এই বেণু-গীত। ইহা আছে বলিয়াই আমরা জগতে সঙ্গীতাদির মাধুর্য্য অনুভব করি।

৪২। ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিজ নিজ চিত্তপটে উদয় হওয়ামাত্রই নয়ন উন্মীলন করিয়া ঐ রূপ দেখিবার আশায় বলিয়াছিলেন ঃ—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।

বক্ত্রং ব্রজেশ-সুতয়োরনুবেণু জুষ্টং
যৈর্বা নিপীত মনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥

ভাগবত—১০।২১।৭

এই শ্লোকে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ-রূপ দেখিবার জন্যই যেন ব্রজকুমারীগণের নয়নের সৃষ্টি হইয়াছিল ; অর্থাৎ তাঁহাদের নয়ন ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিত্য-সম্বন্ধ-যুক্ত। শুধু যে গোপীগণের নয়নই শ্রীকৃষ্ণের রূপের সহিত চির-সম্বন্ধযুক্ত তাহা নহে ; তাঁহাদের সর্ব্ব ইন্দ্রিয় এবং সর্ব্ব-অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের জন্য লালায়িত। ইহা স্বয়ং শক্তিমানের সহিত স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির চির আকর্ষণ। ইহাতে মদনের কোন আধিপত্য নাই। গোপী ও গোপীনাথের মিলনে বিশ্বমোহন মদন স্বয়ং মোহিত হইয়া যায়। বিশ্বজয়ী গর্ব্বিত মদন, যোগী শঙ্করকে মোহনের চেষ্টায় ভস্মীভূত হইয়াছিল। যোগীর নিকট মদনের ঐ অবস্থাই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলায় মদন ভস্মীভূত হয় নাই, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়-প্রীতিজনক 'অল্প' রসমূলক মদন-'ভূমা'র রসে গলিয়া আত্মহারা হইয়া ভূমাতে মিশিয়া গিয়াছিল এবং ভূমানন্দের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল—ইহাই মদন-বিজয়। প্রাকৃত জগতে জীব, নিজ-দেহেন্দ্রিয়ের প্রীতির জন্য অল্প-সুখের লালসায়, কামের দাস হয়। ব্রজলীলায় আনন্দৈক-রসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মদনের আনন্দকে ভূমার আনন্দে এক করিয়া জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ভূমার আনন্দের সহিত নিজ দৈহিক সুখ এক করিতে পারিলে অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়। ব্রজলীলা স্মরণ করিতে হইলে সর্ব্বদা এই তত্ত্ব মনে রাখা উচিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, একদা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অস্থির হইয়া উহা উপশমের উপায়-বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত পিঙ্গলা-নাম্নী এক বার-বনিতার চেষ্টা অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিঙ্গলা এক রাত্রিতে কোন কামাসক্ত পুরুষ আকর্ষণ করিতে না পারিয়া নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় স্থির করিয়াছিল যে, সেই হইতে অভীষ্ট পুরুষের আশা ত্যাগ করিবে; তাহাতে তাহার চিত্ত নিরুদ্বেগ হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহাতে বলিয়াছেন :—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥

ভাগবত—১১।৮।৪৪

পিঙ্গলা তখন "ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্" বলিয়া তাহার প্রাকৃত কাম শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত করায় সে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করা মাত্রই দেখিলেন,—

যারে চাহি ছাড়িতে সেই শুঞা আছে চিতে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥ ৩।১৭।৫২

তখন কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু—

হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন হাহা পদ্মলোচন
হাহা দিব্য সদগুণ সাগর।
হাহা শ্যামসুন্দর হাহা পীতাম্বর
হাহা রাস বিলাস নাগর॥

কাঁহা গেলে দেখা পাই তুমি কহ তাঁহা যাই
এত কহি চলিল ধাইয়া
(তখন) স্বরূপ উঠি কোলে করি প্রভুরে আনিল ধরি
নিজ স্থানে বসাইল লৈয়া ॥ ৩।১৭।৫৬-৫৭

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের এই ঘটনায় প্রাকৃত কাম ও কৃষ্ণ প্রেমের পার্থক্য ও সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই। পিঙ্গলার প্রাকৃত-কাম প্রাকৃত কামুক-পুরুষ হইতে অপসারিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত করায় সে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছিল। মহাপ্রভু সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের আশা ত্যাগ করিতে, তাহা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইলে উন্মত্ততার আরও আধিক্য হইয়াছিল। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের কামবিজয়ী মাধুর্য্য।

৪৩। শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাবের লীলা উপনিষদ্ দ্বারা সমর্থন করা যাইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ একবিংশ মন্ত্রে আত্মার অতিচ্ছন্দা অবস্থার কথা প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে ঐ মন্ত্রের বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক। এই মন্ত্রটি ঃ—

"তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্‌মাভয়ং রূপম্।
তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ
নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা
সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।
তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্॥
বৃঃ আঃ উঃ ৪।৩।২১

এই মন্ত্রে আত্মার অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ কামাতীত নিষ্পাপ ও অভয়রূপ বর্ণনা করিতে ঋষি বলিতেছেন—

'তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো (আলিঙ্গিত পুরুষ) বাহ্যং কিঞ্চন ন বেদ তথা আন্তরং ন বেদ'। প্রিয়া স্ত্রীর সহিত এইরূপ আলিঙ্গিত পুরুষকে ঋষি অতিচ্ছন্দা কামাতীত নিষ্পাপ, অভয় বলিয়া এই অবস্থা বাহ্য বা আন্তর-জ্ঞান-রহিত বলিলেন। ইহাই দেহস্মৃতি লোপ হওয়া। ইহাতে 'তৎ' ও 'ত্বম্' এক হইয়া যায়। অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' হয়। ঋষি নিজেই এই অবস্থা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন "এবমেব অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা (পরমাত্মনা) সংপরিষ্বক্তো বাহ্যম্ আন্তরং চ ন বেদ" তখন আত্মা "আপ্তকামম্ আত্মকামম্ অকামং শোকান্তরম্" রূপ প্রাপ্ত হয়। ইহারই ঠিক অনুরূপ ভাব আমরা রায়-রামানন্দ-কৃত প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-নামক একটি সঙ্গীতে পাই :—

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল ;
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম রমণী ;
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।
এ সখি ! সে সব প্রেমকাহিনী ;
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি।
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন ;
দুঁহুকো মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ।
অব সোই বিরাগ তুহু ভেলি দূতী ;
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি।

এই গীতটি মহাপ্রভুর নিকট রায়-রামানন্দ গাহিতেই—

"প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।"

মহাপ্রভু কেন ইহা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে চিন্তা করিবেন। উক্ত গীতে রাধাকৃষ্ণের যে মিলন বর্ণিত আছে, তাহাতে রমণ ও রমণী ভেদ নাই, অর্থাৎ দেহস্থিত লিঙ্গ ভেদ নাই। ইহাই দেহস্মৃতি লোপ হওয়ায় "বাহ্যম্ আন্তরং ন বেদ"। ইহা দেহের আকর্ষণ নয়। তবে কিসের আকর্ষণ? "তুঁহু মন মনোভব পেশল" অর্থাৎ "মনোভব" তুঁহার মনকে পিষিয়া এক করিয়া দিয়াছে। এবং "তুঁহুকো মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ"; অর্থাৎ পাঁচ বাণই তুঁহুকে মিলন করায়। রমণ রমণী ভেদ নাই অথচ মনোভবের ক্রিয়া কিরূপে হয়? তাহার উত্তর :—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। ২।৮।১২৯

* * * * *

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥ ২।৮ ১১০
শৃঙ্গার রস রাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর। ২।৮।১১২

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ ২।৮।১১৪

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ২।৮।১২১

পুরুষ যোষিৎ স্থাবর ও জঙ্গম এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত

সর্ব্বচিত্ত-হর যে তত্ত্ব তাহাই বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন এবং তাহার পাঁচ বাণ। ইহা প্রেমের আকর্ষণ—ভূমার আকর্ষণ।

৪৪। প্রণবতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে যাহা বর্ণিত আছে তাহা ব্রজলীলার ভগবত্তত্ত্ব সমর্থন করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উপনিষদ্ দ্বারা ব্রজলীলার সমর্থন করিতে গিয়া প্রণব ভগবানের রূপ, এইরূপ উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ইহা বলিয়াছি। মাণ্ডুক্যোপনিষদে "ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্" বলিয়া তাহার উপব্যাখ্যান করা হইয়াছে :—

"ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতম্, তদপ্যোঙ্কার এব॥" ১॥

ইহার অর্থ এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই "ওম্" এই অক্ষরাত্মক। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্ত বস্তুই ওঁকারাত্মক এবং কালত্রয়াতীতও। আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঁকার-স্বরূপই। ওঁকারের 'অ', 'উ' এবং 'ম' এই তিনটি অক্ষর যথাক্রমে বৈশ্বানর জাগরিত স্থান, তৈজস স্বপ্ন স্থান এবং প্রাজ্ঞ সুষুপ্ত স্থান বলিয়া, পরিশেষে বলা হইয়াছে :—

"নান্তঃপ্রজ্ঞং না বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।

অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়-সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" ৭॥

এই মন্ত্রে আত্মার সর্ব্বপ্রকার উপাধি অস্বীকার করিয়া ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়, ব্যবহারের অযোগ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য,

কোনরূপ চিহ্ন-রহিত, মানস চিন্তার অবিষয়। শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশের অযোগ্য, জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তির স্থান, কেবল 'আত্মা' ইত্যাকার প্রতীতি-গম্য, শান্ত, মঙ্গলময় এবং অদ্বৈত বলা হইয়াছে। ইহাই প্রণবের তুরীয় চতুর্থ স্থান। এই স্থান যিনি জানেন, তিনি "সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥" এই তুরীয় স্থানই ব্রজলীলার আরম্ভ শান্ত ভাব। ইহার পরে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব ক্রমে প্রকাশিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম অধ্যায় প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ মন্ত্র :—

"তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে ; যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছতঃ, আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্ ॥"

ছাঃ ১, ১, ৬

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মিথুনের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে সমস্ত মিথুনের স্বরূপ প্রণবে থাকার কথা ঋষি বলিয়াছেন— যখনই প্রণবে মিথুন হয়, তখনই মিথুনীকৃত দ্বৈত পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া অভীষ্ট ফলদায়ক হয়। প্রণবের এই মিথুনই রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন।

অন্যান্য উপনিষদে প্রণবের অনুরূপ ব্যাখ্যা আছে।

৪৫। উপনিষদের ভিত্তিতে ব্রজের মধুর-ভাবের লীলা আস্বাদন করা ভিন্ন জাগতিক প্রাকৃত-ভাবে মধুর-ভাবের লীলা আলোচনা করিলে সর্ব্বনাশ হয়, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। উপনিষদের পটভূমিতে ব্রজের বস্ত্র-হরণ ও রাসলীলা আস্বাদনের এখন চেষ্টা করা যাইতেছে :—

শ্রীকৃষ্ণের বেণু-গীত-শ্রবণে গোপ-কুমারীগণের পূর্ব্বরাগের

সঞ্চার হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পূর্ব্বরাগের ফলে গোপ-কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে পাওয়ার প্রার্থনা করিয়া কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন। ঐ ব্রতের মন্ত্র ছিল—

"নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।" ১০।২২।৪

ব্রতের শেষে উদযাপন দিনে গোপ-কুমারীগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যমুনাতীরে নিজ নিজ বস্ত্র রাখিয়া পরমানন্দে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যমুনার জলে অবগাহন করেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া বস্ত্রগুলি হরণ করতঃ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। কদম্ব বৃক্ষ হইতে স্নিগ্ধ মধুর বচনে গোপ-কুমারী-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—গোপ-কুমারীগণ! তোমরা যথেচ্ছভাবে আমার নিকট নিজ নিজ বস্ত্র বাছিয়া লও। গোপ-কুমারীগণ ব্রত উদযাপন দিনে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দেখিয়া এবং তাঁহার রহস্য পরিহাস বাক্য শুনিয়া একেবারে আনন্দ-রসে মগ্ন হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। কেহই যমুনা জল হইতে তীরে না উঠিয়া কৃত্রিম বালিকোচিত কোপ প্রদর্শনপূর্ব্বক বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তরে নানাপ্রকার পরিহাস বাক্য বলিলে পরিশেষে গোপ-কুমারীগণ দুই হস্তে নিজাঙ্গ আচ্ছাদন করতঃ যমুনা জল হইতে উত্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রজ-কুমারীদিগকে বলিলেন যে, তাহারা উলঙ্গ হইয়া যমুনায় অবগাহন করায় তাহাদিগের ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে। ব্রজ-কুমারীগণ ভীত হইয়া হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক কাত্যায়নী দেবীকে এবং শ্রীকৃষ্ণকে নানাপ্রকার প্রার্থনা জানাইয়া

প্রণাম করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপ-কুমারীগণকে তাহাদের নিজ নিজ বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার এই লীলা শেষ করিয়া বলিতেছেন :—

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং
তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ॥ ১০।২২।২২

ইহার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারীগণকে নানাভাবে পরিহাস করিয়া তাঁহাদের লজ্জা ত্যাগ করাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপকুমারীগণ কোন প্রকার যে অসূয়া করেন নাই, তাহার কারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেম। এখানে মনে রাখা উচিত যে, বস্ত্র-হরণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম আট বৎসরের অধিক নহে। গোপ-কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও ছোট। এই বয়সে যৌন আকর্ষণের কোন কথাই উঠে না। শ্রীকৃষ্ণ ঐ সময়েই গোপকুমারীদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে।

৪৬। শ্রীরাসলীলা শ্রীমদ্ভাগবতের উনত্রিংশ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইহাকে রাস-পঞ্চাধ্যায়ী বলে। এই লীলা, তত্ত্বাংশে যেমন শ্রেষ্ঠ, কবিত্বাংশেও তেমনই মধুর। এই লীলার শেষে শ্রীমদ্ভাগবতকার নিম্নের শ্লোকে উহার ফল-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন—

‘বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ১০।৩৩।৪০

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নাহি, মহা ধীর হয় ॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেম ভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥ ৩।৫।৪৩-৪৫

এই রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে করিয়াছিলেন; তাহা নিম্নের শ্লোকে বর্ণিত আছে।

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ১০।৩৩।২৬

এই শ্লোকে 'অবরুদ্ধসৌরতঃ' পদটি বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য। সুরত (সৌরত) অর্থে কাম-ক্রীড়া। শ্রীকৃষ্ণ 'আত্মনি' অর্থাৎ নিজের ভিতরে সুরতকে অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন। কি প্রকারে কামকে নিজের ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহার নানা প্রকার ব্যাখ্যা টীকাকারগণ করিয়াছেন। সাধারণভাবে এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, রাসলীলার যে কাম তাহা শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক নহে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের সহিত রাসলীলা

করিয়া রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। রাসলীলার তত্ত্ব সম্বন্ধে ঐ লীলা বর্ণনার শেষে মহারাজ পরীক্ষিতের সহিত শ্রীশুকদেব গোস্বামীর আলোচনা হইয়াছিল। তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে সপ্তবিংশ হইতে ষড়্ত্রিংশ শ্লোকে বর্ণিত আছে। মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— শ্রীকৃষ্ণ আত্মকাম ও ধর্ম্ম সংস্থাপক হইয়া কি প্রকারে এই রাস-লীলা, যাহা প্রাথমিক দৃষ্টিতে ব্যভিচার বলিয়া বোধ হয়, তাহা করিলেন? শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইহার উত্তরে বলিলেন ঃ—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ৩০
নৈতৎ সমাচরে জ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং ॥ ৩১

ইহার অর্থ ঃ—যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষণ দোষাবহ নহে, তদ্রূপ তেজস্বী ব্যক্তিগণের উহা দোষের হয় না। জন্ম মৃত্যুশীল অনীশ্বর ব্যক্তি তেজস্বী নহে। কাহাকে তেজস্বী ব্যক্তি বলে, তাহা পরবর্ত্তী ৩৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা অনীশ্বর, অর্থাৎ দেহাদি-তন্ত্র, তাহাদের কদাপি মন দ্বারাও ঐরূপ আচরণ কর্ত্তব্য নহে। রুদ্র ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিলে যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনি মূঢ়তা-প্রযুক্ত দেহাদি-পরতন্ত্র পুরুষ ঐরূপ আচরণ করিলে বিনষ্ট হইবে। তাহার পর শ্রীমদ্-ভাগবতকার আরও বলিয়াছেন ঃ—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্ ॥ ১০।৩৩।৩৬

ইহার অর্থ ঃ—যিনি গোপী ও তাহাদের পতি সকলের, তথা সমস্ত দেহীর অন্তঃকরণ-চারী বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, সেই ভগবান কেবল লীলার জন্য দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের তুল শরীরী নহেন। তাঁহার দোষ সম্ভাবনা কি? শ্রীমদ্-ভাগবতকার সর্ব্বশেষে রাসলীলার উদ্দেশ্য লিখিয়াছেন ঃ—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়ঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ১০।৩৩।৩৭

এই শ্লোকে রাসলীলার অন্যতম উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে যে,—ভক্ত সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ সেইরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা প্রীতির সহিত সম্পাদন করেন, যাহা শ্রবণে মনুষ্যদেহধারী জীব ভগবৎ-পরায়ণ ও লীলাকথা-পরায়ণ হইবে। এই শ্লোকের 'তৎপর' শব্দটি বিশেষ লক্ষ্য-যোগ্য। তৎ অর্থ ভগবান্ এবং তাঁহার লীলায় পরায়ণ। যিনি লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন এবং স্মরণ করেন, তিনিই লীলাপরায়ণ। লীলাপরায়ণের অর্থ লীলা-অনুকরণকারী নহে। পূর্ব্বে ত্রিংশ শ্লোকে লীলা-অনুকরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীরাসলীলার এই তত্ত্ব মনে রাখিয়া উহা আস্বাদন করিতে হইবে।

৪৭। রাসলীলার সূত্রপাত বস্ত্রহরণ-লীলায় হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ বস্ত্র-হরণ লীলায় অতি কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া, সর্ব্বপ্রকার কামনা বাসনা, এমন কি লজ্জা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তখন বলিয়াছিলেন—তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। তাহার

পর শারদীয় পূর্ণিমা তিথিতে যখন পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া নবীন রাগে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিল, তখন,—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১০৷২৯৷১

এই শ্লোকের 'ভগবানপি' অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ যিনি, তিনি ইচ্ছামাত্রই পূর্ণকাম হইতে পারিলেও যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" বলিয়াও তাহাকে "রসো বৈ সঃ" বলা হইয়াছে। 'ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে' ইহাও উক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদের মন্ত্রের অনুরূপ। এই রমণই ব্রহ্মের রস। ইহা আস্বাদন করিতে হইলে ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তিরূপা যোগমায়ার আশ্রয় আবশ্যক। এই রমণ-ইচ্ছা হওয়ার পরই শ্রীকৃষ্ণ 'জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্' অর্থাৎ বামলোচনা স্ত্রীগণের মনোমুগ্ধকর যে কলধ্বনি তাহা বেণু দ্বারা মধুরভাবে গান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বেণু-গীত সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে; তাহা "সর্ব্বভূত-মনোহরম্" ছিল। রাসলীলার বেণু-গীত অস্ফুট কলধ্বনি-সমন্বিত কেবলমাত্র 'বামদৃশাম্' মনোহর হইয়াছিল। এই পার্থক্য লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে; রাসের বেণু-গীত মাত্র মধুরভাবে অনুরক্তা ব্রজ-গোপীদের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। এই ধ্বনি শ্রুতিগোচর হওয়ামাত্রই :—;

নিশম্য গীতং তদনঙ্গ বর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।

আজগ্মু রন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥ ১০।২৯।৪

এই শ্লোকে ব্রজগোপীগণ যে গীত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করার কথা উল্লেখ আছে, তাহা অনঙ্গ-বর্দ্ধন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণ বাৎসল্যভাবে এবং শ্রীদাম, সুবলাদি গোপ বালকগণ সখ্যভাবে ব্যবহার করেন। ইঁহাদের রতিও তদ্রূপ। মধুরভাবে ব্যবহার কেবলমাত্র শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণেরই এবং তাঁহাদের রতি ও মধুরভাবের। সুতরাং মধুর-ভাবাপন্ন ব্রজ-গোপীগণ, যে বেণু-গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের রতি-অনুযায়ী অনঙ্গ বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি তাঁহার ব্রজ পরিবারগণের যাহার যে ভাব ছিল, তাহাই বৃদ্ধি করে। মধুর ভাবান্বিত ব্রজ গোপীগণ 'কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ' বলায় পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মন সমর্পণ করা প্রকাশ পাইতেছে। এই জন্য ব্রজ-গোপীগণের যে অনঙ্গ বৃদ্ধি হইয়াছিল, উহা প্রাকৃত কাম নহে। প্রাকৃত কামে শারীরিক বাহ্য-ব্যবহারের দ্বারা প্রীতি জন্মে। কিন্তু ব্রজ-গোপীগণের কোন বাহ্য-ব্যবহারের নিরপেক্ষ রূপে কৃষ্ণ-প্রীতি ছিল। সুতরাং ব্রজ গোপীগণের ঐ প্রীতি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা-জনিত নহে। উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা-জনিত বটে। তাঁহাদের অন্তর্নিহিত প্রেমাঙ্কুর শ্রীকৃষ্ণের বংশীগান শ্রবণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল।

৪৮। ব্রজসুন্দরীগণ বংশীকলনাদ শ্রবণের পূর্ব্বে নিজ নিজ গৃহে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেছিলেন। বংশীগানের প্রতিক্রিয়া

ব্রজগোপীগণের উপর যাহা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোভাব বুঝা যায়। ঐ প্রতিক্রিয়া সকলের উপর সমানভাবে হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা গোপজাতীয় স্বধর্ম্ম দুগ্ধ-দোহনাদি-কার্য্য, কেহ বা গৃহকর্ম্ম, কেহ স্বজন-স্নেহাদি, কেহ বা পতি-শুশ্রূষাদি, কেহ বা দেহ-ধর্ম্ম ভোজনাদি করিতেছিলেন। ইঁহারা পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও কৃষ্ণ অভিসার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। কোন কোন ব্রজসুন্দরীগণ, যাঁহারা অঙ্গরাগ ও বসনভূষণাদি ধারণ করিতে-ছিলেন, তাঁহাদের বস্ত্র আভরণাদি ধারণ 'ব্যত্যস্ত' অর্থাৎ এক অঙ্গের ভূষণ আর এক অঙ্গে ধারণ করিয়া ছুটিয়াছে। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-নামক স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ। ইঁহারা রাগাত্মিকা এবং নিত্যসিদ্ধা। বংশীগানের প্রতিক্রিয়ায় ইঁহাদের দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছিল, কাজেই কোন্ অঙ্গের কোন্ ভূষণ, তাহার কোন জ্ঞানও ছিল না। এই নিত্যসিদ্ধা হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ-রূপা গোপীগণের সহিত কর্ম্মনিরতা সাধনসিদ্ধা গোপীগণের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়। দুই শ্রেণীর গোপীগণের পার্থক্য রাসলীলার প্রতি কার্য্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

৪৯। এই দুই শ্রেণী ছাড়া অন্য এক শ্রেণীর গোপীগণের উপর বংশীনাদের প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ আছে:—

> অন্তর্গৃহগগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
> কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যু র্মীলিতলোচনাঃ॥
> দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
> ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুগু ণময়ং দেহং সদ্যঃপ্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ ১০।২৯।৯-১১

এই তৃতীয় শ্রেণীর গোপীগণ, যাঁহারা গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকায় বহির্গত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার শুভ-অশুভ দূর হইয়া যায়, এবং পরমাত্মা-রূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত জার বুদ্ধিতে সঙ্গ হওয়ায়ও তাহাদের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন হইয়া সত্ত্বগুণময় দেহ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই গোপীগণ রাগানুগা-সাধনকারিণী গোপী ছিলেন। সাধনসিদ্ধা গোপীগণের সহিত এই তৃতীয় শ্রেণীর গোপীগণের পার্থক্য এই যে, তৃতীয় শ্রেণীর গোপীগণের বংশীধ্বনি শ্রবণের সময়ে গুণময় দেহ ছিল। তাঁহারা সাধনসিদ্ধা না হওয়ায় চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। চিন্ময় দেহ ভিন্ন প্রাকৃত গুণময় দেহে কখনই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ হইতে পারে না। ইহাই এই তৃতীয় শ্রেণীর গোপীগণের বংশীধ্বনি শ্রবণের প্রতিক্রিয়া।

৫০। জার-ভাবে চিন্তাশীল গোপীদের গুণ-দেহ ত্যাগ কিরূপে হইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেনঃ—

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহ মৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ১০।২৯।১৫

এই শ্লোকটি ব্রজলীলা-তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছে। লৌকিক কাম-ক্রোধাদি মনোবৃত্তি দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া যদি হরি অর্থাৎ ভূমা-সম্বন্ধ-যুক্ত হয়, তবে ঐ সব মনোবৃত্তি সার্থক হইয়া তন্ময় অর্থাৎ ভূমা-ময় হইয়া যায়। জাগতিক সমস্ত বিষয় ভূমা হইতে পৃথক করিয়া দেখার জন্যই,

উহা খণ্ড বা অল্প হয়। এই খণ্ডত্ব দূর করিয়া অখণ্ডে মিলিত হওয়াই ব্রজলীলা। শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম বা "নিরুপাধি-মাধুর্য্য-বিগ্রহ"। যে কোন প্রকারে ভূমায় তন্ময় হইলেই বস্তু-শক্তিতে জীবের সকল অনর্থই দূর হয় এবং জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে।

৫১। এই জার-ভাব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে ;—

অতএব মধুররস কহি তার নাম।
স্বকীয় পরকীয় ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ়নির্ম্মল তাঁর ভাব সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ কারণ॥ ১।৪।৩১-৪৪

* * * *

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে, দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥ ১।৪।২৬-৩০

অহৈতুক নিষ্কাম প্রেমের যে বর্ণনা প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে করা হইয়াছে, তদ্দারা এই পরকীয়া ভাব সমর্থিত হয়। কাম ও প্রেমের পার্থক্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে।

কাম, প্রেম, দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমে ত প্রবল ॥
লোক ধর্ম্ম, বেদ ধর্ম্ম, দেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥
অতএব কাম, প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ যে সম্বন্ধ ॥ ১।৪।১৪০-১৪৮

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই কয়টি পয়ারে বর্ণিত প্রেমতত্ত্বের এই স্বরূপ উপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টিতে ও তাহার অতীতে ব্রহ্মের যে আনন্দময় রসের উল্লেখ আছে, তাহারই অনুরূপ। রাসলীলায় ব্রজগোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন রসতত্ত্বেরই ঘনীভূত রূপ।

৫২। ব্রজগোপীগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া উক্ত প্রকারে অভিসার-করতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আসিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ উপেক্ষাত্মক অথচ আকর্ষণশীল বাক্যাবলীতে গোপীদের মিলন ইচ্ছা আরও বর্দ্ধিত করিয়া বিমোহিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সব বাক্যাবলী এমনই গূঢ়রসাত্মক যে, উহাতে উপেক্ষাভঙ্গি, প্রার্থনাভঙ্গি, বাস্তবার্থ ও যুগলার্থ এই চারিপ্রকারে বৈষ্ণব টীকাকারগণ উহা আস্বাদন করিয়াছেন। ভাগবতের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "বদতাং শ্রেষ্ঠঃ" বলিয়া তাঁহার বাক্যকে "বাচঃ পেশৈঃ" (বাক্যের অলঙ্কার) বলায় উহা যে বহু প্রকারের সরস-অর্থযুক্ত তাহা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত উক্তিতে গোপীগণ যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহা যেমন করুণ-রসোদ্দীপক, তেমনি প্রণয়কোপ-ব্যঞ্জক। গোপীদিগের উক্তি ভাগবতে "সংরম্ভ-গদগদ-গিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ" বলিয়া উল্লেখ আছে। এই সমস্ত উক্তিরও বৈষ্ণব-টীকাকারগণ চারিপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। গোপীগণের বাক্যাবলী যে মাত্র একজন গোপী করেন নাই, তাহা উহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যাবলী উপস্থিত গোপীগণের উপর ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছে, ইহা গোপীদিগের উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গোপীগণ যে ভিন্ন ভিন্ন যূথ অর্থাৎ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। বৈষ্ণব

সাধকগণ গোপীগণকে প্রথমতঃ শ্রীমতী রাধিকা ও তদীয় ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ ও অনঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীগণ এক যূথভুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বপক্ষীয় যূথ নাম দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, চন্দ্রাবলী ও তদীয় শৈব্যা পদ্মাদি সখীগণকে অন্য যূথভুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের বিপক্ষযূথ নাম দিয়াছেন। এই দুই যূথভুক্ত গোপীগণ সকলেই স্বরূপ হ্লাদিনী-শক্তির প্রকাশ। নিত্যসিদ্ধা ছাড়া অন্যান্য গোপীগণ যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সাধন সিদ্ধা। তাঁহারা নিজ নিজ সাধন অনুযায়ী ভিন্ন যূথে স্থান পান। এই যূথ বিভাগ রস-আস্বাদন এবং রস-বিস্তারের জন্য। সকলেরই উদ্দেশ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের রস-আস্বাদন বৃদ্ধি করা। শ্রীমতী রাধিকা হ্লাদিনী-শক্তির পূর্ণ প্রকাশ। অন্যান্য গোপী শ্রীমতী রাধিকারই কায়ব্যূহ বা ছায়া।

রাধা সহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপী হয় রসোপকরণ॥

চৈতন্যচরিতামৃত—১।৪।১৭৭

এমন কি, চন্দ্রাবলী যূথও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রসবৃদ্ধি করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই সমস্ত বিবরণ প্রকাশ্যভাবে নাই। এমন কি শ্রীমতী রাধিকা বা মধুর ভাবাত্মিকা অন্য কোন গোপীর নাম শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। অন্যান্য পুরাণে এই সমস্ত গোপীগণের নাম আছে। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম-যুক্ত গোপীগণের যে ব্যবহার ও চরিত্রের বর্ণনা আছে, ঐরূপ ব্যবহার ও চরিত্রবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন গোপীগণের রাসলীলায় যোগ দেওয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অনুমান করা যায়।

৫৩। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের প্রথম সাক্ষাতের পরেই উক্তি-প্রত্যুক্তিতে যে রস-আস্বাদ ও রসবিস্তার হইয়াছিল, তাহা দেখান হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রস-আস্বাদনের ইচ্ছায় দূর হইতে বেণুনাদ করিয়া যেমন গোপীদের অনঙ্গবর্দ্ধন করার কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তেমনই তিনি সাক্ষাতে রূপ ও বচন-মাধুরী এবং কটাক্ষ ও নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা গোপীদের মধুর-রতি গাঢ়তর করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উপেক্ষাভঙ্গিতে গোপীদের সংসার ও আশ্রম-ধর্ম্মের প্রথমতঃ উপদেশ দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন—

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥

ভাগবত—১০।২৯।২৩

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন—তোমরা যে আমার প্রতি অভিস্নেহবশতঃ যন্ত্রিতাশয় অর্থাৎ বশীকৃত চিত্ত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। সকলেরই আমার প্রতি এইরূপ ভালবাসা আছে। ইহা বলিয়াই গোপীদিগকে বলিলেন ঃ—

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ ১০।২৯।২৭

শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকর্ষ অপেক্ষা তাঁহার বিষয় শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ইত্যাদির প্রাধান্য দিয়া গোপীদের-প্রতি গৃহে প্রত্যাগমনের এই উপদেশে ভিন্ন ভিন্ন যূথের গোপীর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হওয়া তাঁহাদের উত্তরে বুঝা যায়।

৫৪। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ-রূপা নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের মনোভাব শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের ৩৪ হইতে ৪১ শ্লোকে প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—তুমি আমাদের চিত্ত, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমস্তই আকর্ষণ করিতেছ। আমাদের ঃ—

পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা॥
সিঞ্চাঙ্গ ন স্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং॥ ১০।২৯।৩৪-৩৫

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্॥ ১০।২৯।৩৯-৪১

এই কয়টি শ্লোকের ভাব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্ন কয়েকটি ত্রিপদীতে অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি নারি কাঢ়িবার।
তারে ধ্যান শিক্ষাকর লোক হাসাইয়া মার
স্থানাস্থান না কর বিচার॥

নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী তার মধ্যে কুটীনাটী
শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ॥

দেহ স্মৃতি নাহি যার সংসার কূপ কাঁহা তার
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ সমুদ্র জলে কামতিমিঙ্গিলে গিলে
গোপীগণে লহ তার পার॥

২।১৩।১৩৩—১৩৫

এই গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ নিত্য। তাহারা চেষ্টা করিয়াও ঐ আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ইহা রাগাত্মক আকর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগই যাঁহাদের আত্মা তাঁহারা ঐ আকর্ষণ দ্বারা নিত্য আকৃষ্ট। তাঁহাদের স্বরূপ ও কৃষ্ণ অনুরাগ একই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়-বিকৃতি।

৫৪। (ক) গোপীগণ চেষ্টা করিয়াও যে শ্রীকৃষ্ণচিন্তা

ছাড়িতে পারেন না, তাহা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর এক প্রলাপবচনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে :—

দেখি এই উপায়ে, শ্রীকৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড় কৃষ্ণ কথা ধন্য কহ অন্য কথা ধন্য
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥
কহিতেই হৈল স্মৃতি চিত্তে হৈল কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে সেই শুঞা আছে চিতে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥
রাধাভাবের স্বভাব আন কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিতে।
কহে যে জগত মারে সে পশিল অন্তরে
এই বৈরী না দেয় পাশরিতে॥

৩।১৭।৫১—৫৩

শেষের দুইটি ত্রিপদী অতি গভীর-ভাবব্যঞ্জক। শ্রীমতী রাধার স্বভাব অন্যের স্বভাব অপেক্ষা অন্যরকম। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে কাম অর্থাৎ অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর নবীন-মদন-রূপে সর্ব্বদাই দেখেন। ঐ মূর্ত্তি জগতকে মারে—কামের অন্য নাম মার। তাই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই রাধার ত্রাসের সঞ্চার হয়, কিন্তু সে বৈরী হইলেও তাহাকে পাশরা যায় না।

'এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।

সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥

২।২।৩৫

৫৫। সাধন সিদ্ধা গোপীগণের উপরে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাকৃত উক্তির প্রতিক্রিয়া নিম্ন শ্লোকে বুঝা যায় :—

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তি রঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥

ভাগবত—১০।২৯।৩২

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্ম
ন্নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥
তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতী স্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥

ভাগবত—১০।২৯।৩৩,৩৮

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীগণকে বলিয়াছিলেন—পতি, পুত্র ও সুহৃদ্‌গণের যথাযোগ্য সেবাই স্ত্রীগণের ধর্ম্ম, তাহার উত্তরে এই সাধনসিদ্ধা গোপীগণ বলিতেছেন, তুমিই সকলের পরম বান্ধব, আত্মা এবং নিত্যপ্রিয়। তুমি প্রসন্ন হইলে সমস্তই সুখের হয়।

অতএব হে সর্ব্বদুঃখহারিন্, আমরা তোমার চরণ-সেবন আশায় তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া "দেহি দাস্যম্"। গোপীদের এই উক্তি বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে, আত্মার সম্বন্ধেই পতিপুত্রাদি সমস্ত প্রিয় হয় বলিয়া যে বর্ণনা আছে, তাহারই অনুরূপ।

৫৬। উভয় শ্রেণীর গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তির পর

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥
উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্॥
বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু-
নীবীস্তনালভন-নর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ॥
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥

ভাগবত—১০।২৯।৪২-৪৪-৪৬

এই তিনটি শ্লোকে যে সমস্ত হাবভাব ও ক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহার মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নানাপ্রকারে নিজের মাধুর্য্য রস বিস্তার করিয়া গোপীগণের কামোদ্দীপন করেন এবং বিবিধভাবে রমণ করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, গোপীগণের এই কাম শ্রীকৃষ্ণই উদ্দীপন করিয়াছিলেন। গোপীগণের ইহা নিজের কাম নহে। শ্রীকৃষ্ণ কেন কাম উদ্দীপন

করিলেন, তাহার কারণ বলা হইয়াছে, রস আস্বাদন করিবেন বলিয়া। সুতরাং গোপীগণের এই কাম নিজ-সুখের জন্য নহে—কৃষ্ণ-সুখের জন্য। কৃষ্ণ-সুখের জন্যই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য ও ব্যবহার। তাঁহাদের নিজ বেশভূষা কটাক্ষাদি হাবভাব সমস্তই ঐ একই উদ্দেশ্যে। ইহাই ব্রজের অপ্রাকৃত কাম। গোপীদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-সাধন জন্যই। তাঁহাদের দেহ মন ও প্রাণেও শ্রীকৃষ্ণেরই রসাস্বাদন :—

তবে যে দেখি গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহ তো কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত।
এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ-সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥
আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সভার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এই বিরোধের এই দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসান।

গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাঢ়ে যার নাহিক সমতা ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ শোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত ॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাঢ়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী প্রেমে নাহি কাম দোষে ॥

চৈতন্যচরিতামৃত—১।৪।১৫৩—১৬৬

এই কয়টি পয়ারে তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে অষ্টম অনুবাকে যে আনন্দ রসের বর্ণনা আছে, তাহার ধ্বনি স্পষ্ট শুনা যায়। আচার্য্য শঙ্কর এই অনুবাকের ভাষ্যে, লৌকিক আনন্দ কি প্রকারে ব্রহ্মানন্দে মিলিত হইতে পারে, তাহার যে বিবরণ দিয়াছেন, উহা এই কয়টি পয়ারে উল্লিখিত তত্ত্বেরই অনুরূপ। শঙ্কর বলিয়াছেন—কেবল অবিদ্যার প্রভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞান শক্তি আবৃত হওয়ায় এবং অজ্ঞান-বৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাক্তন কর্ম্ম-বাসনা বশে এবং আনন্দজনক বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন, ব্রহ্মানন্দ ব্যবহারিক জগতে খণ্ড, অস্থির ও অনিত্যরূপে প্রকাশ হয়। ঐ সমস্ত দোষের হ্রাস ঘটিলে এই লৌকিক

আনন্দই ব্রহ্মানন্দে পরিণত হইতে পারে। শ্রীরাসলীলায় সাধন-সিদ্ধা গোপীগণের লৌকিক, অস্থির ও অনিত্য আনন্দ, ব্রহ্মানন্দে মিলিত হইয়াছিল। রাসলীলায় ইহাই মদন-বিজয়। দেহেন্দ্রিয়-প্রীতিজনক অল্প সুখ, ভূমার সুখে এক হইয়া, সমস্ত জগত মধুময় করিয়াছিল।

(৫৭) গোপী ও গোপীনাথের রাসে এই প্রথম মিলন সমস্ত গোপীগণের সহিত সমভাবেই হইয়াছিল। মিলনের এই সমতার প্রতিক্রিয়া স্বপক্ষীয়া ও বিপক্ষীয়া গোপীযূথ-দ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছিল। চন্দ্রাবলী-প্রমুখ বিপক্ষীয়া গোপী-যূথ শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে পরম-লব্ধমানা অর্থাৎ সৌভাগ্যমদান্বিতা হইয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের এই সমতায় মানিনী হইয়াছিলেন। যদিও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া শ্রীমদ্-ভাগবতে প্রকাশ্য ও স্পষ্টভাবে নাই; তথাপি "সৌভগমদম্" ও "মানঞ্চ" এই দুইটি শব্দ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২৯।৪৮ শ্লোকে যে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে জনৈকা গোপীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের যে বিবরণ আছে, তদনুযায়ী গৌড়ীয় টীকাকারগণ এইরূপ বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া অনুভব করিয়াছেন। শ্রীরাধিকার মান ব্রজলীলার একটি প্রধান অংশ। প্রণয়-মান মাধুর্য্য রসাস্বাদন ও রস বিস্তারের একটি প্রধান বিষয়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, এই মান ইন্দ্রিয় ভোগের অভাবজনিত নহে। ইহা প্রণয়-মান। এই মানে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করে। গোপীদের দেহপ্রীতির যে তত্ত্ব পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তদনুযায়ী এই প্রণয়-মান শ্রীকৃষ্ণ

প্রীতির সহিত যুক্ত। শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের সমতায় মানিনী হইয়া রাসলীলা পরিত্যাগকরতঃ চলিয়া যান। তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের রস আস্বাদনের ব্যাঘাত হওয়ায় শ্রীমতী রাধিকার অন্বেষণে রাসলীলার স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। এই অন্তর্দ্ধানের কারণ পূর্ব্বোক্ত 'তাসাং তৎ সৌভগমদম্' শ্লোকে উল্লেখ আছে। উহা অন্যান্য গোপীগণের সৌভাগ্য গর্ব্ব 'প্রশমন' এবং শ্রীমতী রাধিকার মান 'প্রসাদনের' জন্যই বুঝা যায়। ইহার ফলে সৌভাগ্যমদান্বিত গোপীগণ বিরহে অধৈর্য্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণ করিতে থাকেন। মানিনীর সঙ্গ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মান-প্রসাদনের চেষ্টা করিতে থাকেন। রাসলীলার ইহাই মধ্যভাগ।

(৫৮) শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গর্ব্বযুক্ত গোপীগণ "অসৌ অহম্" অর্থাৎ আমিই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহার পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহারা বৃক্ষরাজি, তুলসী, পুষ্প, লতা, ফলবান্ বৃক্ষ, ধরণী, মৃগী ইত্যাদি স্থাবর জঙ্গমের পুলক দর্শনে, তাহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-দর্শন পাইয়াছে মনে করিয়া, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অন্বেষণকারী গোপীগণ কিছুকাল অন্বেষণের পর শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে জনৈকা অন্য গোপী থাকার আভাস—শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন শ্লোক হইতে জানা যায়।

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালি-কুলৈর্মদান্ধৈঃ।

অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥
ভাগবত—১০।৩০।১২

এই অন্য-গোপীর প্রণয় মানে রাসস্থলী ত্যাগ করা এবং তাঁহারই অন্বেষণে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হওয়ার বিষয় শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী ব্যবহারে বুঝা যায়।

(৫৯) অন্বেষণকারিণী গোপীগণ যখন কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইলেন না, তখন—

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণ-কাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ১০।৩০।১৪

কৃষ্ণলীলাত্মিকা হইয়া পূতনা-বধাদি যাবতীয় কৃষ্ণলীলা গোপীগণ অভিনয় করার কথা পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে বর্ণিত আছে। ঐ সব লীলাকারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির এবং শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গোপী অভিনয় করিতে লাগিলেন। উহার দুইটি শ্লোক নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ঃ—

আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ব্বতীম্।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥
কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥ ১৮-১৯

এই লীলার অনুকরণের একমাত্র হেতু লীলায় তন্ময়তা। বিরহে শ্রীকৃষ্ণকে ভাবিতে ভাবিতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ লীলাময় ও আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই চিন্তা করিতে করিতে যাঁহারা ব্রহ্মময় হইয়া ব্রহ্মে মিশিয়া যান,

তাঁহাদের সহিত গোপীগণের লীলাতন্ময়তার সাদৃশ্য থাকিলেও রসাস্বাদনের দিক্ দিয়া গোপীগণের আনন্দ ব্রহ্মসাযুজ্য-আনন্দ হইতে অনেক অধিক। ব্রহ্মসাযুজ্যে দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ব্রজ-গোপীদের কৃষ্ণলীলার তন্ময়তায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে সমস্ত প্রকার দ্বৈত ভাবাপন্ন কার্য্যে তন্ময়তা হয়। ঐ সব কার্য্যের মাত্র দর্শনানন্দ উপভোগ না করিয়া এই অনুকরণে উহার স্বরূপ আনন্দের আস্বাদন গোপীগণ পাইয়াছিলেন।

৬০। গোপীগণ এইভাবে কিছুকাল অভিনয় করিয়া পুনরায় কৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারা প্রথমতঃ 'ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশ-যবাদিভিঃ" পরিশোভিত শ্রীকৃষ্ণ পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া গোপীগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঐ পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া কিছুদূর গেলে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত মিলিতভাবে জনৈকা গোপীর পদচিহ্ন দেখিলেন। এই যুগল পদচিহ্ন দেখিয়া গোপীগণ বলিলেন—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ১০।৩০।২৮

'অনয়ারাধিতো' এই শব্দে শ্রীমতী রাধিকাকে ইঙ্গিত করার কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহারের এই চিহ্ন দেখিয়া স্বপক্ষীয়া ও বিপক্ষীয়া গোপীগণের মনোভাব ভিন্ন ভিন্ন রকম হওয়া পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকে বুঝা যায়। বিপক্ষীয়া গোপীগণ ঈর্ষ্যান্বিতা এবং স্বপক্ষীয়া গোপীগণ আনন্দিতা হইয়াছিলেন।

এই বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া গোপীগণের উভয়যূথ যুগল

পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে আরও নানাপ্রকার চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম প্রিয়াকে কখনও স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, কখনও বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া কবরী-বন্ধন করিয়াছেন এবং উভয়ে একত্র হইয়া আরও নানা-প্রকার রসক্রিয়া করিয়াছেন। এই সব বিবরণে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার মান-প্রশমনের জন্য এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহার সহিত প্রথম রাসনৃত্যে সমস্ত গোপীগণ লইয়া সমভাবে যে রসক্রিয়া হইয়াছিল, তাহার পার্থক্য আছে। শ্রীমতী রাধিকার সহিত রসক্রিয়া একৈকনিষ্ঠ। ইহাতেই রাধাকৃষ্ণ মিলনই যে মাধুর্য্যরসের স্বরূপ এবং ঐ রস বৃদ্ধির জন্যই অন্যান্য ক্রিয়া, তাহাও প্রকাশ হয়।

৬১। এই সব চিহ্ন দেখিয়া রাধাকৃষ্ণ মিলনে অন্য গোপীগণের যে অনুভব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব নিজেই ঐ মিলন বর্ণনা করিতে উল্লেখ করিয়াছেন :—

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোহপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্॥

ভাগবত—১০।৩০।৩৫

এই শ্লোকটী একটু দুর্ব্বোধ্য। ইহার প্রথম চরণে বলা হইয়াছে যে, স্বাত্মরত, আত্মারাম, অখণ্ডিত হইয়াও ঐ রমণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বাত্মরতি আত্মা-রামতা অখণ্ডিততা-আদি যে পূর্ণতা, তাহা এই রমণীর সান্নিধ্যে লোপ হওয়ায় স্বয়ং এই রমণীর রস আস্বাদনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত

হইয়াছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষা শুধু প্রেমতত্ত্বেই সম্ভব হয়, তাহা প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থ সুবোধ। কিন্তু দ্বিতীয় চরণে যে বলা হইয়াছে যে, কামীদিগের দৈন্য ও স্ত্রীগণের তুরাত্মতা এই রমণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছিলেন, তাহা বুঝা একটু শক্ত। ইহার সামঞ্জস্য নিম্নলিখিতরূপে করা যায়। কামক্রীড়ার সাধারণতঃ দুইটি দিক আছে। একটি দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়, অন্যটি দেহেন্দ্রিয়ের অতীতে চিৎসম্বন্ধীয়। যাহারা এই ক্রীড়া দেহেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে করে, তাহাদের দৈন্য ও তুরাত্মতা, ক্রীড়ার পরিবর্ত্তী ব্যবহারে অর্থাৎ কামীদের দৈন্য ও স্ত্রীদের তুরাত্মতায় প্রকাশিত হয়। আর যাঁহারা এই ক্রীড়ায় স্বাত্মরত, আত্মারাম ও অখণ্ডিত যে পূর্ণ ভগবান্ তাঁহারই আনন্দ আস্বাদন করিতে পারেন, তাঁহারা স্বাত্মরত, আত্মারাম ও অখণ্ডিত অবস্থায় উপনীত হন। একই ক্রীড়ার, মনোভাবের পার্থক্যে বিপরীত ফল দেখানই বোধ হয় এই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

৬২। শ্রীরাধাকৃষ্ণের রমণের এই বর্ণনার পরই শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন যে, যে-গোপী শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইলেন, তিনি নিজকে 'বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্' মনে করিলেন। তাহার ফলে প্রথমতঃ ঐ গোপী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ;—

"ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥" ১০।৩০।৩৭

শ্রীমতী রাধিকার এই আব্দার শ্রীকৃষ্ণের রস আস্বাদনের

চরম প্রকাশ। ইহাতে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যে সমস্ত অলৌকিক সর্ব্বশক্তিমানের ঐশ্বর্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, তাহার কিছুই শ্রীমতী রাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে মধুর রতি ছিল, তাহা খর্ব্ব করিতে পারে নাই। গোবর্দ্ধনধারণ কালীয়দমন দাবানল-পান এবং বিশাল শক্তিশালী অসুরগণের বধ যে-পুরুষ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এইরূপ দাবী যে রমণী করিতে পারে, সেই রমণীর মধুর রতির প্রভাব সাধারণের কল্পনাতীত। শ্রীমতী রাধিকা এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন :—

'এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।' ১০।৩০।৩৮

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিতে তাঁহার প্রেমবশ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীমতী রাধিকার আব্দার দুরাত্মতা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে স্কন্ধে লইতে চাওয়া দৈন্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের ও গোপীনাথের সম্বন্ধ অন্যান্য স্থানে যাহা বর্ণিত আছে, তাহাতে শ্রীমতী রাধিকার এই আব্দার দুরাত্মতা যে নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই আব্দার শ্রীমতী রাধিকার দেহেন্দ্রিয় সম্পর্কিত নহে, উহা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উদ্দীপন করিয়া তাহার আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন এবং শ্রীমতী রাধিকাকে স্কন্ধে করিতে চাহিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

৬৩। শ্রীরাধা-গোবিন্দের ইহার পরের লীলা অতীব জটিল রহস্যময়। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলেন। সেই বধূ অনুতাপ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হে নাথ, হে রমণ, হে মহাভুজ, হে প্রিয়তম, হে সখে, দীনহীনা দাসীকে দেখা দাও।"

ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত।
হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ১০।৩০।৩৯

শ্রীমতীর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের এই অন্তর্দ্ধান এবং শ্রীমতীর নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য কামনা প্রেম বৈচিত্ত্যের অতি গভীর ভাবব্যঞ্জক। শ্রীমতী যখন এই ভাবগ্রস্ত হন, তখন কঠোপনিষদের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ :—

'আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।' ২।২১

নিকটে থাকিতেও যে প্রেমাস্পদ প্রেমিকের নিকট হইতে বহুদূর বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ যে, প্রেমিক সর্ব্বদাই নিজকে প্রেমাস্পদ অপেক্ষা অপূর্ণ বলিয়া মনে করে। প্রেমাস্পদের আস্বাদন প্রেমিকের নিকট কিছুতেই পূর্ণ হয় না। প্রেমিক মনে করে—

কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুই॥

চৈঃ চঃ—১।৪।১৩২

৬৪। শ্রীমতীর এইরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণকারিণী গোপীগণ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতই অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণ শ্রীমতীকে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিলেন। স্বপক্ষীয়া সখীগণের সেবায় শ্রীমতী কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহার নিকট তিনি যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নিকট মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারই দৌরাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ যে অন্তর্ধান করিয়াছেন, তাহা শুনিলেন। ইহাতে স্বপক্ষীয়া গোপীগণ

শ্রীমতীর এই প্রেমবৈচিত্ত্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলেন। কিন্তু বিপক্ষীয়া গোপীগণ ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে স্বপক্ষীয়া ও বিপক্ষীয়া গোপীগণ একত্র হইয়া কিছুকাল কৃষ্ণ অন্বেষণের পর যমুনাপুলিনে সমবেত হইয়া "জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ"। এই সময়ে শ্রীমতী রাধিকার সান্নিধ্যে সমস্ত গোপীগণের মনোভাব অতীব করুণরসাশ্রিত হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমনের আশায় আকাঙ্ক্ষিত হইয়া কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন।

৬৫। গোপীগণের এই প্রার্থনাগীতি শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ে উনষষ্টি-টি শ্লোকে বর্ণিত আছে। এই প্রার্থনা-গীতির ভাষা ও ভাব অতি গভীর। করুণ ক্রন্দন-সমন্বিত এই প্রার্থনা গীতিতে শ্রীকৃষ্ণ যে নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইবেন, এইরূপ সুদৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস গোপীদের সুদৃঢ়। এই গীতিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, শব্দ-স্পর্শ আদি মাধুর্য্য যে সর্ব্বদাই গোপীগণের চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ ও ত্বগাদি আকর্ষণ করিতেছে, তাহার বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণরূপ কি প্রকারে গোপীগণের চক্ষুঃ আকর্ষণ করিতেছে, তাহা নিম্নের শ্লোকে বুঝা যায়।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিল-কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥ ১০।৩১।১৫

এই শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে বলিয়া পুনঃ উহার ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা গোপীগণের জিহ্বাকে কি প্রকারে আকর্ষণ করিতেছে, তাহা নিম্নের শ্লোকে বুঝা যায়—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্। ৩১।১৪

ইহার অর্থ—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত-মত বর্ণিত আছে :—

তনু মন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্যরস, জগৎ ক'রে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥

নাগর! শুন তোমার অধর চরিত
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত॥ ৩।১৬।১১২-১১৩

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যে গোপীগণের কর্ণকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহা নিম্নের শ্লোকে বুঝা যায় :—

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া, বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধর-সীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥ ১০।৩১।৮

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গস্পর্শ যে গোপীগণের বাগিন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। তাহা নিম্নশ্লোকে সুস্পষ্ট :—

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে, চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহং ॥ ৫
প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণি-ফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥ ৭

৬৬। এই সমস্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে বিপ্রলম্ভভাব বলে। এই বিপ্রলম্ভভাবের মাধুর্য্য, মিলনজনিত সম্ভোগভাব অপেক্ষা গভীরতর। ইহার পরিপক্ক অবস্থায় দেহ-স্মৃতি সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং ইহা এক অখণ্ড আনন্দে পরিণত হয়। গোপীগণ সর্ব্বশেষে যে বিরহগীতি গান করিয়াছিলেন, তাহা এই :—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১০।৩১।১৯

ভাগবতের এই শ্লোক লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীরায়রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন :—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃত যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয়॥

২।৮।১৬৭-৭০

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ-হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গমবিহার॥

২।৮।১৭৪-৭৬

৬৭। গোপীগণ এইরূপ প্রেম-বিহ্বল হইয়া গান করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে যখন "কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ সুস্বরং রুরুদুঃ" তখন,

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ৩২।২

শ্রীকৃষ্ণের এই মূর্ত্তিকে 'সাক্ষান্ মন্মথ-মন্মথঃ' বলার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। গোপীগণ-সমন্বিত এই রূপই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের চরম বিকাশ। কান্তাভাব ব্যতীত অন্যভাবে এই মাধুর্য্যের প্রকাশ হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার একবিংশ পরিচ্ছেদে এইরূপ বর্ণিত আছে:—

চড়ি গোপী মনোরথে মন্মথের মন মথে
নাম ধরে 'মদনমোহন'।

জিনি পঞ্চশর দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ ২।২১।৮৭

এই মদনমোহনরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব হইলে চেতনাহীন কোন ব্যক্তি চৈতন্য লাভ করার পর সর্ব্বপ্রকার উদ্দেশ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তভাবে যেরূপ ব্যবহার করে, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বিপ্রলম্ভ ভাবমুক্ত গোপীগণ কিছুকাল সেইরূপ ব্যবহার করিয়া পরে নিজ নিজ বসনাঞ্চল পাতিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বসাইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ,—

"চকাস গোপী-পরিষদ্‌গতোঽর্চ্চিত
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ ॥" ১০।৩২।১৪

গোপী-সভাগত শ্রীকৃষ্ণের এই শোভা ত্রৈলোক্য-শোভার আধাররূপে প্রকাশমান হওয়ার কথা এই শ্লোকে উল্লেখ আছে। বাস্তবিকই ত্রিভুবনে যে-সৌন্দর্য্য শোভা পাইতেছে, তাহা গোপী ও গোপীনাথের মিলনজনিত শোভার এক কণা বটে।

৬৮। গোপীগণ তখন ঈক্ষণ ও হাস্য-লীলায় সুশোভিত হইয়া এবং ভ্রূবিলাস-বিভ্রমে ভূষিত হইয়া অনঙ্গ-উদ্দীপক শ্রীকৃষ্ণের কর ও চরণ সম্মর্দ্দন করিতে করিতে ঈষৎ কোপবশে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তরে বলিলেন—

এবং মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

১০।৩২।২১-২২

প্রথম শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপী-মাহাত্ম্য এবং নিজের অন্তর্দ্ধানের কারণ বলিয়া দ্বিতীয় শ্লোকটিতে গোপীগণের 'নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধু কৃত্যে'র প্রত্যুপকার সুচিরকালেও সাধন করিতে পারিবেন না—ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তিরোহিত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ বলিয়াছেন যে, গোপীগণ যেরূপ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনে আসিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ পরোক্ষে-ভজনের জন্য তিরোহিত হইয়াছিলেন। এই পরোক্ষ-ভজনই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীগণের বিপ্রলম্ভ রসের আস্বাদন। এই বিপ্রলম্ভ-ভাব মাথুর-বিরহে পূর্ণ হইয়া ভাব সম্মিলন হওয়ার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পরে উদ্ধব-সংবাদেও ইহা আলোচিত হইবে। বিপ্রলম্ভ-ভাব আস্বাদন করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, তিনি গোপীগণের প্রেমের ঋণে অনন্তকাল ঋণী। যুগে যুগে এই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, এবং অনন্তকাল ধরিয়াও হইবেন না। গোপীগণের নিজের প্রেমই তাহাদের প্রেমের প্রতিদান হউক—শক্তি ও শক্তিমানের লীলার ইহাই চরম প্রকাশ। শক্তি অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত শক্তিমানের সেবা করিতেছেন। শক্তিমানও অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল

পর্য্যন্ত শক্তির প্রেমের ঋণ শোধ করিতে পারিতেছেন না। তাই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর গাহিয়াছেন :—

"প্রভু প্রভু প্রভু হে—অনন্তানন্তময়"

৬৯। ইহার পর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের উক্তরূপ মনোজ্ঞবাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের বাহু গ্রথিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, শ্রীকৃষ্ণ,—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়ো দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥ ১০।৩৩।৩

ইহার অর্থ—গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি যোগেশ্বর, তিনি প্রতি গোপীযুগলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উভয় হস্ত দুই দিকস্থ গোপীদ্বয়ের কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। প্রত্যেক গোপী শ্রীকৃষ্ণকে 'স্বনিকটং মন্যেরন্'। এই প্রকারে একই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ একই স্বরূপে ও একই রূপে বহু হইয়া রাসোৎসব-রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। এই আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণের ও গোপীগণের তুল্যরূপ হইয়াছিল। গোপীগণ নানা-প্রকার ভঙ্গিতে নৃত্য ও কৃষ্ণ গুণগান করিতে করিতে "তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ।" ১০।৩৩।৮

ব্রজ-গোপীগণের এই গানে ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। কোন কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের সাধু সাধুবাদ প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে ষড়ঙ্গাদি স্বরের আলাপ আরম্ভ করিল এবং তাঁহাকে ধ্রুব নামক তাল উচ্চারণ করিয়া উচ্চগ্রামে আনয়ন করিল। এই প্রকারে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেরূপ বিবিধ-বিভ্রম প্রকাশপূর্ব্বক

ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ আলিঙ্গন, করাভিমর্ষণ, স্নিগ্ধতাবলোকন, উদ্দাম বিলাস ও উদ্দাম হাস্যকরতঃ সেই সকল ব্রজ গোপীর সহিত কেলি করিতে লাগিলেন। ইহাতে বোধ হইল ঃ—

'রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ'। ১০।৩৩।১৭

গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ আলো ও ছায়ায় ন্যায়। এক ছাড়া অন্য থাকিতে পারে না। একথা অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গোপী ও গোপীনাথের রাসনৃত্য দর্শনে পূর্ণচন্দ্র এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি নিজেদের গতি বিস্মৃত হইয়া নিশ্চল হইয়াছিল। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও লীলা নিমিত্তে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। ইহার পর গোপী ও গোপীনাথ যমুনা জলে অবগাহন করিয়া জলকেলি করিলেন। এই ক্রীড়া করিতে করিতে "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে···অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান ভগবৎপ্রিয়াঃ।" ১০।৩৩।৩৮

এই প্রকারের রাসলীলা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে রস আস্বাদন অনন্তকাল হইতে করিতেছেন, তাহারই এক কণা প্রকৃতির সমস্ত বস্তুকে রসময় করিতেছে।

৭০। রাসলীলা-বর্ণনার পর সুদর্শন নামক বিদ্যাধরের উদ্ধার, শঙ্খচূড় নামক কুবের পরিষদ, গোপীগণকে হরণ করায় তাহাকে এবং কংস প্রেরিত অরিষ্ট, কেশী ও ব্যোমাসুর নামক অসুরগণের বধ বর্ণিত আছে। এই সব লীলা, পূর্ব্বে যে সব লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তদনুরূপই।

৭১। শ্রীকৃষ্ণ দিবাভাগে গোষ্ঠে গমন করিলে গোপীগণের মনোভাব শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। গোপীগণ রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসলীলায় বর্ণিতমত রসাস্বাদন প্রায়ই করিতেন। দিবাভাগে শ্রীকৃষ্ণ বনগমন করিলে গোপীগণ বিরহ দুঃখে দিন যাপন করিতেন। এই সময়ে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বনে যে সমস্ত কার্য্যের কথা অন্যের নিকট শুনিতেন, তাহাই গান করিতেন, কখনও বা মা যশোদার নিকট গিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র আস্বাদন করিতেন। দিবা-অবসানে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠ গৃহে ফিরিতেন, তখন তাঁহার আগমনের পথে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার মনোহর রূপ আস্বাদন করিয়া বলিতেন :—

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষন্মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা॥
যদুপতি র্দ্বিরদরাজবিহারো যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্॥
ভাঃ—১০।৩৫।২২-২৩

শ্রীশুকদেব গোস্বামী নিম্নের শ্লোকে ব্রজ গোপীগণের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া এই লীলা শেষ করিয়াছেন।

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলা নু গায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ॥ ১০।৩৫।১৪

৭২। মথুরাধিপতি যখন কিছুতেই ব্রজে অনুচর পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিতে সক্ষম হইল না, তখন মথুরায় এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান-করতঃ শ্রীমদ্ অক্রূরকে ব্রজে পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করে। তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স একাদশ

বর্ষ হইয়াছিল। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন শ্রীমদ্‌ভাগবতে উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ পরিত্যাগের পর ব্রজ গোপীগণের মনোভাব মাথুর বিরহনামে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই বিরহও প্রেমতত্ত্বের একটি অঙ্গ। প্রেমতত্ত্ব বিরহ ও মিলন উভয় রসাত্মক। রাসলীলার বর্ণনার সময়ে এবং শ্রীকৃষ্ণ দিবা-ভাগে গোষ্ঠে গমন করিলে গোপীগণের মনোভাব বর্ণনায় বিরহ রসের আস্বাদ পাওয়া গিয়াছে। মাথুর বিরহে ঐ রস ঘনীভূত নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্ন-লিখিত কয়টি ত্রিপদীতে বর্ণিত আছে ঃ—

বাহে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ২।২।৪৪-৪৫

বিরহের রস প্রাকৃত জগতেও সর্ব্বদা অনুভূত হয়। অতি অন্তরঙ্গ প্রাণাধিক প্রিয়তম কাহারও অভাব হইলে তাহার চিন্তায় যে রস, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন। বিরহের পরিপূর্ণ অবস্থায় দেহস্মৃতি লোপ হইয়া যে অন্তরে মিলন হয়, তাহা প্রেমতত্ত্ব-অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহার সমর্থন করা হইয়াছে। ব্রজগোপীগণের মাথুর বিরহ ঐ তত্ত্বেরই ঘনীভূত রূপ। তাহারই ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার।

৭৩। মহাভাগ অক্রূর কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে যান। তিনি একজন ভগবদ্-ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই যে কংস তাঁহাকে মথুরায় আনিতে শ্রীমৎ অক্রূরকে পাঠাইতেছে, তাহা তিনি জানিয়াও যে দৌত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ প্রকারে দর্শনলাভ। সমস্ত পথ তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন চিন্তায় যাপন করিয়াছিলেন। যখন শ্রীমৎ অক্রূর গোকুলে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন দিবাকর অস্ত গেলেন। শ্রীমৎ অক্রূর পদ্ম-যব-অঙ্কুশাদি চিহ্নসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের পদরেখা রথ হইতে দেখামাত্রই প্রেমে তাঁহার গাত্ররোম কণ্টকিত হইয়া উঠিল। অশ্রুতে তাঁহার নয়নদ্বয় ভরিয়া গেল, এবং তিনি রথ হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক ভূমিতে পড়িয়া 'কি আশ্চর্য্য' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণপদ রেখায় লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তাহার পর কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, ব্রজমধ্যে গোদোহন স্থানে অগ্রজ শ্রীযুক্ত বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন এই প্রথম বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মনোহর রূপ দেখামাত্রই আনন্দরাগে অক্রূরের নয়নযুগল আচ্ছন্ন হইল। সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং এতাদৃশ ঔৎসুক্য জন্মিল যে, তিনি প্রথমতঃ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। মহর্ষি নারদ পূর্ব্বদিন শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বধের জন্য তাঁহাকে মথুরায় লইতে কংস অক্রূরকে পাঠাইতেছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে দেখামাত্রই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াও চক্রাঙ্কিত কর দ্বারা আকর্ষণ

পূর্ব্বক অক্রূরকে আলিঙ্গন করিলেন। ইতিমধ্যে ব্রজরাজ নন্দ অক্রূরের আগমন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া ভোজনাদি করাইলেন। অক্রূরের আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া নন্দ মহারাজ সমস্ত গোপদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, গোরস ও অন্যান্য সকল উপাদান লইয়া আগামী কল্য সকলকে মধুপুরী গিয়া উৎসব দেখিতে হইবে ও কংসরাজকে গোরস আদি উপঢৌকন দিতে হইবে। নন্দ মহারাজের এই ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনে তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কার ভাব বুঝা যায় না। ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণের বলবীর্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল, তাহাই বোধ হয়।

৭৪। কান্তাভাবাপন্ন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইতে অক্রূর আসিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহের আশঙ্কায় ভীত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ইহার কারণ শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন যে, তাঁহারা 'অচ্যুতাশয়া' ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করিতেন না। নন্দমহারাজাদি গোপগণের মনোভাবের সহিত ব্রজ-গোপীগণের মনোভাবের পার্থক্য এই ঘটনায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ ব্রজ-গোপীগণ বিধাতাকে দোষারোপ করিয়া বলিতেছেন :—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসং।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতং॥
ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম নশ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ॥

১০।৩৯।১৯-২১

ইহার ভাবার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে :—

অরে বিধি! তোঁ বড় নিষ্ঠুর।
অন্যোন্য দুর্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন,
'অকৃতার্থান্' কেনে করিস্ দূর?
অরে বিধি! অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাইলি আমার।
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্যস্থান,
পাপ কৈলে দত্ত অপহার॥
অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ',
ইহা যদি কহ দুরাচার।
তুঞি অক্রূরমূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণে নিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥ ৩।১৯।৪৪-৪৬

ইহার পরই গোপীগণের মনে হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের সৌহৃদ্য অস্থির; কারণ গোপীরা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যাহার সেবায় রত হইয়াছিল, সে-ই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। এই কথা মনে হইতেই তাঁহারা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে আরোহণ করিতেছিলেন, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিতে

লাগিলেন, হায়! আমাদের জীবনে ধিক! এই যে শ্রীকৃষ্ণ কঠিন চিত্ত হইয়া রথে আরোহণ করিতেছেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপেরা শকট লইয়া যাইতেছে। স্থবিরেরা তাহাও বারণ করিতেছেন। আমরা সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিব, অন্যে আমাদের কি করিবে? কারণ—

"মুকুন্দ-সঙ্গান্নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাদ্দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্" ॥

ভাঃ—১০।৩৯।২৯

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ অর্দ্ধ নিমেষের নিমিত্তও দুস্ত্যজ, যখন তাহাই ছাড়িতে হইতেছে, তখন মৃত্যু হইতেও আমরা ভয় করি না। এই বলিতেই গোপাদিগের রাসোৎসব ও গোষ্ঠ-বিহারের কথা মনে হইল এবং বলিতে লাগিলেন :—

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র .
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাং।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং স্বতিতরেম তমো দুরন্তম্॥ ১০।৩৯।২৭

যোঽহ্নঃক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরীতো
গোপৈর্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্।
বেণুং ক্বণন্ স্মিতকটাক্ষনিরীক্ষণেন
চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে নু কথং ভবেম॥ ১০।৩৯।২৮

ইহা বলার পরই গোপীগণ সমস্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া

'রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি চ'

ভাঃ—১০।৩৯।২৯

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগের তদ্রূপে সন্তাপিত দেখিয়া 'শীঘ্র

আসিব'—এই সপ্রেম বচন দূত দ্বারা প্রেরণপূর্ব্বক সান্ত্বনা দান করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বৃন্দাবনে ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎভাবে দর্শন আর বর্ণনা নাই। গোপীগণ যাবৎ রথের পতাকা ও রেণু লক্ষ্য হইল, তাবৎ চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। পরে নিরাশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত গান করতঃ নিতান্ত শোকান্বিতভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

৭৫। ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণ বিরহে যেরূপে দিনযাপন করিতেছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৪৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী যাওয়ার কিছুদিন পর একদা নিজের প্রিয়তম একান্ত ভক্ত উদ্ধব মহাশয়কে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক্ কহিলেন, হে সৌম্য উদ্ধব! শীঘ্র ব্রজপুরে গমন কর। আমার পিতা নন্দ ও মাতা যশোদার প্রীতি বিধান কর; এবং আমার বাক্য দ্বারা গোপীদের মদ্বিয়োগ-জন্য মনঃপীড়া নিবারণ কর। ইহা বলিতেই শ্রীকৃষ্ণের মনে ব্রজ হইতে বিদায়কালীন দৃশ্য মনে হইল এবং বলিলেন :—

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈ র্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥ ১০।৪৬।৫

এই শ্লোকে মথুরা আগমনের সময় 'আমি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব'—এই কথা যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করতঃ গোপীগণ জীবনধারণ করিতেছেন, ইহাই বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, গোপীগণের আত্মা তাঁহাদের নিজ দেহে ছিল না। এই আত্মা

বহন করিয়া শ্রীমন্ উদ্ধব মহাশয় দিবাশেষে ব্রজে উপনীত হইয়াছিলেন। ব্রজরাজ নন্দ উদ্ধব মহাশয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্॥ ১০।৪৬।১৯

নন্দ মহারাজ এই কথা বলিতেই প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসা তীব্র হইয়া উঠিল এবং বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি একবার স্বজনবর্গকে দর্শন করিতে আসিবে? আমরা কি তাহার সস্মিতবদন আবার দেখিব? শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হইলে আমাদের সকল ক্রিয়াই শিথিল হইয়া যায়। আমরা তাহার ক্রীড়াস্থান নিরীক্ষণ করিলে আমাদের তদাত্মতা প্রাপ্তি হয়। এই কথা বলিতে বলিতে গোপরাজ নন্দের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। মা যশোদাও অবিরাম অশ্রুপাত করিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। উদ্ধব মহাশয় নন্দ যশোদার এই ভাব দেখিয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া নিজকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন ;—

'মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।' ১০।৪৬।৩৬

উদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে 'শীঘ্রই দেখিতে পাইবে' বলিয়া নন্দ যশোদাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম পরবর্ত্তী একটি শ্লোকে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥ ১০।৪৬।৪২

উদ্ধব মহাশয়ের এই উক্তি সাধন-সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের

যোগ্য। বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজিলে তিনি পুত্ররূপে নিশ্চয়ই দেখা দেন। উদ্ধব মহাশয়ের সান্ত্বনার মর্ম্ম ইহাই। শ্রীকৃষ্ণ যে শীঘ্র ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, উদ্ধব মহাশয়ের সান্ত্বনার মর্ম্ম তাহা নহে।

৭৬। রাত্রিপ্রভাতে ব্রজদ্বারে একখানি রথ দেখিয়া ব্রজগোপীগণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, মথুরা হইতে জনৈক ব্যক্তি এই রথে আগমন করিয়াছে। তখন তাহারা প্রথমতঃ পুনরায় অক্রূরই আগমন করিয়াছে অনুমান করিয়া ক্রোধপুরঃসর বলিতে লাগিলেন—যে ব্যক্তি কংসের প্রয়োজন সাধন জন্য কমললোচন কৃষ্ণকে এখান হইতে মথুরায় লইয়া গিয়াছে, সেই বোধ হয় মৃত কংসের শ্রাদ্ধের জন্য পিণ্ড প্রস্তুত করিতে আমাদের শরীরের মাংস লইতে আসিয়াছে। ইতিমধ্যে কৃতাহ্নিক হইয়া উদ্ধব মহাশয় তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ বাহুদ্বয়, নবীন কমল তুল্য লোচন, অরবিন্দ-সন্নিভ বদন, পীত বসন ও পদ্মমালাদি ভূষণ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'এ ব্যক্তি কে?' ইহার দর্শন পরমসুন্দর—বেশভূষা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়। ইহার পর উদ্ধব মহাশয়কে উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া নির্লজ্জভাবে রোদন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে কখন প্রশংসা কখন নিন্দা করিয়া নানাপ্রকার বচন বলিতে লাগিলেন। এই সময় একটি ভ্রমর গুঞ্জন করিতে করিতে তথায় আসিলে ;—

প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥ ১০।৪৭।১

৭৭। গোপীদিগের এই বচন, ভ্রমরগীতা এবং তাঁহাদের ঐ অবস্থা প্রেমের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জীবনের শেষ কয় বৎসর অনেক সময় হইত। তৎসময়ে তাঁহার একান্ত ভক্ত শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায়রামানন্দ ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয়গণ মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া দিব্যোন্মাদ অবস্থার যে লিপি করিয়া গিয়াছেন, তদবলম্বনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উহার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে।

শেষে যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে।
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥

—২।২।২-৪

এই সময়ে মহাপ্রভুর অবস্থা যেরূপ হইত, তাহা নিম্ন কয়টি ত্রিপদীতে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

নানা ভাবের প্রাবল্য হইল সন্ধি শাবল্য
ভাবে ভাবে হইল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ॥
মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষু বন
গজ যুদ্ধে বনের দলন।

প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ তনু মনের অবসাদ
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥

২।২।৫৪-৫৫

স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ
দেহ হইল পুলকে ব্যাপিত।
হাঁসে কাঁদে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥
গুরু নানা ভাবগণ শিষ্য প্রভুর তনু মন
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥

২।২।৬২।৬৫

৭৮। ভ্রমর গীতায় গোপীগণ যে সমস্ত উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে গোপী-মনোভাব পূর্ব্ব বর্ণিত ত্রিপদীগুলিতে যাহা ব্যক্ত আছে, তাহাই বুঝা যায়। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ভাব সম্মিলনে পরস্পরের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে দেখা যায়। এইরূপ মিলনে রস, রসের আস্বাদক ও আস্বাদ্য তিন-ই এক হয়। ভ্রমর-গীতা পড়িলে গোপীদের যে তাহাই হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রেমতত্ত্ব অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ এবং ঐ উপনিষদে আত্মার অতিচ্ছন্দা রূপ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা গোপীগণের এই অবস্থা সমর্থিত হয়। ইহাই বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ চতুর্দ্দশ মন্ত্রের উল্লিখিত 'সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ'

অবস্থা। জ্ঞানমার্গের সাধকগণ এই অবস্থায় সাযুজ্য মুক্তিতে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন। ভক্তিমার্গের সাধকগণের এই অবস্থায় কোন প্রাকৃত ভেদ না থাকিলেও মাধুর্য্যানন্দের রসাস্বাদনের ভেদ আছে। এই অবস্থায় ভগবদ্ভক্তের যে শারীরিক বিপ্লব হওয়ার বর্ণনা দেখা যায়, তাহার কারণ প্রাকৃত দেহ ও মন অপ্রাকৃত রসের আস্বাদনে প্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে না। তজ্জন্যই শরীরে নানাপ্রকার ভাবোদগম ও বিপ্লব হইয়া পরিশেষে উন্মাদ অবস্থাপ্রাপ্তি হয়। বাহ্যিক এই অবস্থা হইলেও পূর্ণ রসাস্বাদ হইতে থাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় যে সমস্ত প্রলাপোক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়।

৭৯। শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় গোপীদিগের এই গীত শুনিয়া ও তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া বলিলেন—হে গোপীগণ, তোমরা তোমাদের যথা-সর্ব্বস্ব পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পাইয়াছ। তোমাদের এই বিরহে ভগবৎ-প্রেম-সুখ দেখিতে পাইলাম। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে প্রিয় বার্ত্তা আমি লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহার মূর্ত্তরূপ তোমাদিগের ভিতর দেখিলাম। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, যে, তাঁহার সহিত তোমাদিগের বিয়োগ কখনও হয়ও নাই হইবেও না। তিনি যে বাহ্যতঃ তোমাদের দৃষ্টির দূরে রহিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার ধ্যানে তোমাদের সহিত তাঁহার সন্নিকর্ষ হইবে, এই জন্যই।

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥ ১০।৪৭।৩৪

৮০। ইহার পর গোপীগণ উদ্ধব মহাশয়কে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার প্রশ্নে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করিলে উদ্ধব মহাশয় ব্রজবাসিদের সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের অনুগত হইবার জন্য কতিপয় মাস পরমানন্দে ব্রজে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হইত—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ ১০।৪৭।৫৮

এই বচনে উদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন যে, গোপীগণের প্রেম সামান্য নহে। সংসারত্যাগী মুনিগণ মুক্ত হইয়া ইহা বাঞ্ছা করেন। যাহার শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র রস, তাহার আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। এই প্রেম ঈশ্বর প্রসাদেই হইয়া থাকে। ইহা জাতি, আচার অথবা জ্ঞান অপেক্ষা করে না ; কেবল ভজন-মাত্রেই সিদ্ধ হয়। উদ্ধব মহাশয়ের এই উক্তিটি কঠোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রের অনুরূপ :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ কঠ—২।২৩

ইহার পর উদ্ধব মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নের চারটি শ্লোকে বিবৃত আছে :—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥
আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজু র্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥
যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ
র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥

ভাঃ—১০।৪৭।৬০-৬৩

এই শ্লোক কয়টি ব্রজলীলার সহিত জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞাপক। ইহার আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

বলদেবের ব্রজে আগমন ঃ—

৮১। একদা বলভদ্র সুহৃদ্‌গণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রজে আসিলে ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়া নেত্রজলে অভিষেক করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবাপন্ন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক নানারূপ বাক্য বলদেবকে বলায় তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ—

সংকর্ষণ স্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈ র্হৃদয়ঙ্গমৈঃ।
সান্ত্বয়ামাস ভগবান্ নানানুনয়কোবিদঃ॥ ১০।৬৫।১৬

৮২। সর্ব্বশেষে ব্রজবাসীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎভাবে দর্শন ও আলাপ প্রভাস-যজ্ঞ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে হওয়ার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে। এই উপলক্ষে ব্রজবাসিগণ তৎ-কালীন ভারতবর্ষে বর্ত্তমান প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কান্তাভাবাপন্ন গোপীগণ বহুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যে ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভাগবত তাহা বর্ণনা করিতেছেন।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥ ১০।৮২।২৭

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ব্যাঘাত হয় বলিয়া চক্ষুর পলক-নির্ম্মাতা বিধাতাকে দোষারোপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এত দীর্ঘকাল পর শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে পাইয়া নেত্রপথে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া নিবিড়রূপে আলিঙ্গন করতঃ যোগিগণের দুর্লভ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন। গোপীগণের এই তন্ময়তা, যোগিগণের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতেও যে উচ্চ, তাহাই বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া আলিঙ্গন করতঃ নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন :—

ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ১০।৮২।৩১

এই শ্লোকে ভক্তিই অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপায় বলিয়া গোপী-গণের রাগকে "মৎস্নেহঃ মদাপনঃ" বলা হইয়াছে। স্নেহকারী স্নেহের পাত্র অপেক্ষা বড় এবং যাহাতে স্নেহের পাত্র স্নেহকারীর প্রতি আকৃষ্ট হন, ইহাই উক্ত দুই শব্দের লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে তিনি যে গোপীগণের প্রেমাধীন—ইহাই বলিলেন। কিন্তু তথাপি কেন তিনি বৃন্দাবনে যাইতে পারিতেছেন না, তাহার কারণ নিম্নলিখিত শ্লোকে উল্লিখিত আছে :—

নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি সঃ॥ ১০।৮২।২৯

এই শ্লোকের সারার্থ এই যে, "আমি তোমাদের পরিত্যাগ করিয়া আসি নাই ; ভগবানই ভুত সকলের নিয়োগ ও বিয়োগের কারণ।

৮৩। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে অধ্যাত্ম উপদেশ দিলে কোন কোন গোপী ; "তদনুস্মরণধ্বস্ত জীবকোশাস্তমধ্যগম্॥" তাঁহার অনুধ্যান দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরাদি উপাধি ধ্বংস করতঃ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পর নিত্যসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ রূপা এক গোপী বলিলেন :—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ১০।৮২।৩৫

এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ গভীর ধ্যান সম্পন্ন যোগেশ্বরগণের এবং সংসার-কূপপতিত ব্যক্তিগণের উত্তরণের অবলম্বন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি-রূপা গোপী বলিতেছেন যে, আমরা এই দুইরূপ ব্যক্তির মধ্যে কেহই নহি। আমরা যোগী নহি; আমরা সংসার কূপেও পতিত হই নাই। আমাদের মনই বৃন্দাবন। তাহার কারণ, বৃন্দাবনে আমাদের ঘর সংসার আছে বলিয়া নয়। আমাদের ঘর সংসার, এমন কি দেহও তোমার বই আমাদের নয়। বৃন্দাবনে প্রতি তরু লতা প্রতি ফুল ফল, বৃন্দাবনের মাটির প্রতি কণিকা, সমস্তই তোমার। সেই জন্যই আমাদের ইচ্ছা হয় যে, তোমারই সেই বৃন্দাবনে, তোমার পাদপদ্ম, প্রস্ফুটিত হইয়া বৃন্দাবন-রূপ গৃহ-সেবিকা আমাদের মনরূপ বনে সতত আবির্ভূত হউক। এই উক্তিতে গোপী-প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রেম সম্পদ তাঁহারা সাধন ভজন করিয়া পান নাই। ইহা তাঁহাদের নিজেদেরই ধন এবং নিত্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন :—

অন্যের 'হৃদয়' মন মোর মন 'বৃন্দাবন'
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন তাঁহা তোমার সঙ্গম
না পাইলে না রহে জীবন॥ ২।১৩।১৩০-১৩১

কুরুক্ষেত্রে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য, বিষয় সম্পদ্, আড়ম্বর, উৎসব ইত্যাদি দেখিয়া ও শুনিয়া মাধুর্য্য-রসবতী গোপীগণের এই মনোভাব খুবই স্বাভাবিক। তাঁহারা একান্তভাবে বৃন্দাবনের নানা সৌন্দর্য্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরসের আস্বাদন পাইয়াছেন। ঐশ্বর্য্যবহুল কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে সে আনন্দ পাইতে পারেন না।

৮৪। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য প্রভাস যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের দর্শনে অতি স্পষ্ট হইয়াছে। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভাষায় বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ "নিরুপাধি মাধুর্য্য বিগ্রহ।" আর কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ সকলের "অধীশ্বর এবং ধ্যেয় বস্তু।" শ্রীযুত রূপগোস্বামী মহোদয় বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে বাহির না করিয়া দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণের জীবনী পৃথক নাটকে বর্ণনা করিতে দেবী সত্যভামার আদেশ পাইয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও গোস্বামিপাদকে জানাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হইতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাঁতে॥ ৩।১।৬১

ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ, মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ হইলেও ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত। দ্বারকা-কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য দ্বারা মাধুর্য্য শিথিল হইয়াছে। পূর্ণ-ভগবান ব্রজের শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক প্রকাশ—দ্বারকা-কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ।

৮৫। ব্রজে যে সমস্ত লীলার বিষয় বলা হইল, তাহাতে সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রস পূর্ণভাবে রূপায়িত হইয়াছে। এই

সমস্ত রসের মূল এই যে, ইহাতে কামনা বাসনা দেহেন্দ্রিয় প্রীতিমূলক না হইয়া সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ-রূপে দেখা যায়। এই রস প্রথমতঃ দাস্যরূপে সেবোন্মুখী হয় এবং ক্রমে উহা ঘনীভূত হইয়া সখ্য, বাৎসল্যভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সর্ব্বশেষে উহা মধুরভাবে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে। শাখা, প্রশাখা-ক্রমে ইহার অনন্ত বিস্তার আছে। মহাজনদের পদাবলীতে, কথকতায় এবং অন্যান্য রচনায়, ব্রজলীলার রস নানা-প্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে ও হইতেছে। উহা পাঠ, শ্রবণ ও মনন করিতে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা প্রাকৃত মায়িক সংসারের ব্যাপার নয়। উহা প্রেমতত্ত্বেরই প্রকটরূপ এবং সর্ব্বশক্তিমানের সহিত তাঁহার স্বীয় শক্তির নিত্য-বিলাস। তাহা মনে না রাখিয়া মানুষ নিজেই উহার নায়ক নায়িকা হইয়া অনুকরণ করিতে গেলে সর্ব্বনাশ হয়। ঐ লীলার সহিত জাগতিক ব্যাপারের সম্বন্ধ এই যে, উহা স্বীকার না করিলে জাগতিক ব্যাপার সম্ভব হয় না। উহা আছে বলিয়াই জগতে আনন্দ আছে এবং এই আনন্দ আছে বলিয়াই জাগতিক ব্যাপার নির্ব্বাহ হইতেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায় "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" ব্রহ্মানন্দবল্লী—৭ম অনুবাক্

৮৬। প্রাকৃতিক শক্তি ও তাহার প্রকাশ এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধের উদাহরণ দ্বারা ব্রজভাব ও সাংসারিক মায়িকভাব উভয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ কতকটা বুঝা যাইতে পারে। যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি আছে বলিয়াই আমরা সুইস্ টিপিয়া আলো ও

বাতাস পাই। তেমনি রসময় ভাবের নিত্যপ্রবাহ আছে বলিয়াই জগতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঐ রসময় ভাব প্রকাশিত হইতেছে। সুইস্ টিপিয়া বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলো বাতাসাদি রূপে প্রকাশ করার ন্যায়, প্রতি পিতামাতার নিজ সন্তানের সহিত মিলনে বাৎসল্যরস প্রকাশ হইতেছে। উহার পাত্র রাম, শ্যাম, যদু, মধু যে-ই কেন হউক না, তাহাতে আসে যায় না। দাস্য, সখ্য ও মধুর প্রভৃতি ভাবের ও নিত্যরসের প্রবাহ—অবস্থা, কাল, পাত্র বিশেষে সংসারে প্রকাশিত হইতেছে।

৮৭। উপনিষদের মন্ত্র দ্বারা এই নিত্যভাব ও রসের অস্তিত্ব সমর্থিত হয়ঃ—

অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

বায়ু র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ কঠ—৫।৯-১১

এই সব মন্ত্রের অনুরূপ উক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনায় আছে—"অনন্তরূপে একরূপ নাহি কিছু ভেদ।"

এই তিনটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, জাগতিক শক্তি অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত শক্তির স্বরূপ ঐ ঐ আশ্রয়ে থাকিলেও তাহা অবিকৃত অবস্থায় ঐ ঐ আশ্রয়ের ভিতরে ও বাহিরে চির বিরাজমান, এই সমস্ত জাগতিক শক্তির ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়াও নিজে অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ অবস্থায় চির বিরাজমান আছেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩।১৫

অশব্দ অস্পর্শ অরূপ প্রভৃতি পদে প্রাকৃত—জড়া প্রকৃতির বিকার জাত শব্দ-স্পর্শ-রূপেরই নিষেধ বুঝাইতেছে। সেই অনাদি, অনন্ত, নিত্য বস্তুকে জানিয়া মৃত্যুর মুখরূপ সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

৮৮। ইহাতে প্রশ্ন উঠে যে, যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয় ইত্যাদি তাঁহাকে কি করিয়া জানা যায়! অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত জীব অনুভব করিবে কি করিয়া? ঋষি ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ ২।২৩

এই মন্ত্রে বলা হইতেছে যে, আত্মা প্রবচন, মেধা বা শ্রুতির দ্বারা লভ্য নহে। তিনি যাহাকে বরণ করেন, তাহার নিকট স্বীয় তনু প্রকাশ করেন। তাঁহাকে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণানন্দ ও পরম মহৎ স্বরূপ জানিয়া তিনি জগতের-সমস্তে এবং তাহার অতীতেও আছেন, ইহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তিনি বরণ করিলেই। এই বরণই কৃপা। তিনি কৃপা করিয়া জীবকে বরণ করিলেই জীব তাঁহাকে বরণ করিতে পারে। ইহা চেষ্টাসাধ্য নহে; কৃপা-লব্ধ। কেন উপনিষদের ভাষায় তিনি "প্রতিবোধ বিদিতম্।" ব্রহ্মকে এইভাবে বরণ করিতে পারিলেই ব্রহ্মের স্বীয় রূপ দেখা যায়। ঈশোপনিষদেও অনুরূপ মন্ত্র পাই ঃ—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ঈশ—১৫॥

এই মন্ত্রে উল্লিখিত হিরণ্ময় পাত্রই দেহেন্দ্রিয় প্রীতির কামনা বাসনা। তাহার দ্বারাই সত্যধর্ম্মের স্বরূপ আবৃত আছে। উহা তিনি কৃপা করিয়া অপসারণ করিলেই তাঁহার স্বীয় রূপ দেখা যায়। ব্রহ্মের এই রূপই ব্রজলীলা। তাহাতে মানুষের স্থান পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখান হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রজলীলায় জীবের স্থান।

১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের প্রধানতঃ তিনটি শক্তি—স্বরূপ-শক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। স্বরূপ শক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ ব্রজলীলায় প্রকট। ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। স্বরূপ শক্তির প্রকাশ ছাড়াও সাধনসিদ্ধ পরিকরের কথা ব্রজলীলায় বলিয়াছি। ঐ সাধনসিদ্ধ পরিকরগণ সিদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে মায়াশক্তি প্রভাবে কৃষ্ণ বহির্মুখ ছিল। জীবশক্তির ইহাই বিশেষত্ব। জীবশক্তি অনাদিকাল হইতে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমাবধি মায়াশক্তির প্রভাবে কৃষ্ণবহির্মুখ থাকে। কিন্তু স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ায় স্বাধীনতা জীবশক্তির আছে। সেইজন্য জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তির আনুগত্যে তাহার বহির্মুখীনতা ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইয়া সমস্ত কাজ করিলে সিদ্ধাবস্থায় ব্রজে স্থান পায়। ইহাই ব্রজলীলায় জীবের স্থান।

২। এখন প্রশ্ন উঠে, জীব যদি ভগবৎশক্তিরই প্রকাশ হয়, তবে কেন ভগবদ্-বিমুখ হইয়া মায়াশক্তির প্রভাবে বিষয়েন্দ্রিয় সুখের কামনা বাসনায় নানাপ্রকার শোক তাপ ভোগ করে? এই প্রশ্নের উত্তর 'শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণ' এই স্বরূপ গুণ হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই উত্তরটি আপাত-দৃষ্টিতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যিনি করুণ, তিনি কেন জীবকে মায়ার অধীনে ত্রিতাপ ভোগ করাইবেন! এই সম্বন্ধে গভীর চিন্তা

করিলে বুঝা যায় যে, জীবের ত্রিতাপ ভোগ, তাহার অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ হইবার যে স্বাধীনতা আছে, তাহারই ফল। জীবের এই স্বাধীনতা যদি না থাকিত, অর্থাৎ জীব যদি যন্ত্রই হইত, তবে ভগবৎ-কারুণ্যরসের কোন স্থান থাকিত না। করুণার মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্যই মায়াশক্তি নিত্য-বহির্মুখী এবং জীবকে প্রলোভন দেখাইয়া নিজের অধীনে আনার চেষ্টা করে। জীব যখন সেই প্রলোভন-মুক্ত হইয়া ভগবদুন্মুখ হয়, তখন মায়া ও জীবশক্তি উভয়ই ভগবৎকারুণ্য আস্বাদন করিয়া নিজকে ধন্য মনে করে। ইহাই জীবের স্বাধীনতার সার্থকতা। দুঃখ কষ্ট ভোগ না করিলে পর কারুণ্যের আস্বাদ পাওয়া যায় না। দুঃখ কষ্টের ভিতরে যে অপূর্ব্ব ভগবৎ-করুণার মাধুর্য্য আছে। তাহার আস্বাদনেই দুঃখ কষ্ট ভোগের সার্থকতা। ভগবৎকারুণ্যের নানাপ্রকার প্রকাশ জগতে দেখা যায়। চিকিৎসালয়, দাতব্য-ভাণ্ডার, শিক্ষালয়, ধর্ম্মমন্দির ইত্যাদি সমস্তই ভগবৎকরুণার প্রকাশ। মানুষের রোগ, শোক, অজ্ঞানতা, অভাব—ইত্যাদি কতপ্রকার দুঃখ কষ্ট আছে, তাহা উপশমের জন্য ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান পৃথিবীতে হইয়াছে। কিন্তু দুঃখ কষ্টের আত্যন্তিক নাশ ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের করিবার সাধ্য নাই। ভগবদুন্মুখ হইয়া কার্য্য করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হইলে সাম্যাবস্থা হয়, এবং দুঃখ কষ্ট ভোগ থাকে না। তখন বুঝা যায়, যাহাকে দুঃখ কষ্ট মনে হইয়াছিল, তাহা ভগবৎ করুণা—ইহাই জীবের ব্রজলীলায় প্রবেশের দ্বার—'শান্ত' ভাব।

৩। শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির কিছু আলোচনা করিলে জীবের

ব্রজলীলায় স্থান সুবোধ্য হইতে পারে। এই মায়াশক্তিতেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মায়ার এই তিন রকম কার্য্যের কারণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। সত্ত্ব গুণে প্রকাশ হয়, রজোগুণে কর্ম্ম ও ক্রিয়া হয়, তমোগুণে কর্ম্ম ও ক্রিয়ার অভাবে জড়ত্ব আসে। সৃষ্টিতে যাহা কিছু চেতন, অচেতন পদার্থ আছে, সমস্তই এই তিন গুণ দ্বারা চালিত হয়। সৃষ্টির প্রথম অবস্থা সত্ত্ব গুণাত্মক প্রকাশ ভাব। ইহা ভগবানের স্বরূপ চিৎশক্তির ক্রিয়ায় সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তশীল কল্পে কল্পে সৃষ্টির আদিতে এই প্রকাশই হিরণ্য-গর্ভ-রূপে পরিচিত। তাহার পূর্ব্বে সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ সাম্যা-বস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের কর্ম্মবীজসহ, যাহাকে 'অব্যক্ত' বলা হয়, সেই অবস্থায় থাকে। প্রেমতত্ত্বের আনন্দোচ্ছ্বাসই এই সাম্যা-বস্থার বিক্ষোভের কারণ। ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছাই ব্রহ্মানন্দের উচ্ছ্বাস। আনন্দের প্রকাশ—সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের কর্ম্মজনিত আনন্দের বীজ এই প্রকাশের পূর্ব্বে প্রেমতত্ত্বের নিত্যলীলায় থাকে। যে আনন্দ উচ্ছ্বাসে এই বিক্ষোভ স্পন্দন হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি নিত্য-লীলায় শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি সেই আনন্দ কল্পে কল্পে সৃষ্টিতে প্রকাশ করিতেছে। মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইলেও কেন জীবকে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্মুখ করেন, তাহার কারণ যে শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্য রসাস্বাদনে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

৪। মায়াশক্তি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্মুখ, তাহা আলোচনা

করা আবশ্যক। মায়াশক্তির ক্রিয়ায় অব্যক্ত সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ হইলে ঐ শক্তির নিজেরই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়; ইহাই জাগতিক প্রাকৃত নিয়মাবলী (Laws of nature)। এই নিয়মাবলীর বিস্তার বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে ক্রমে মানুষের গোচর হইতেছে। অবিরাম ও অপরিবর্ত্তনীয় কার্য্যে এই নিয়ম একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে; এবং তাহা অপরিহার্য্য ও নির্ম্মম বলিয়া বোধ হয়। তজ্জন্যই ইহা যে প্রেমতত্ত্বেরই ক্রিয়া তাহা আবৃত হইয়া উহা তমোগুণাত্মক জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। এই জড়ত্বই বহির্মুখীনতা। মানুষের নিজের জীবনে প্রথমতঃ যে কার্য্য ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় হয়, পরে ঐ কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে উহা যে ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, সে বোধ থাকে না। ইংরাজীতে এই অবস্থাকে habit বলে। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইচ্ছাশক্তির প্রণোদিত কার্য্য পুনঃ পুনঃ হইতে থাকায় উহা ইচ্ছাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। প্রাকৃতিক নিয়মেতেও ঠিক এইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। যে প্রাকৃতিক নিয়ম আদিতে ভগবানের ইচ্ছাশক্তি-প্রণোদিত ছিল, তাহা পরে ঐ শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়। তাই ইংরাজীতে একটি প্রচলিত কথা আছে—'habit is the second nature' বাস্তবিক যে কোন ক্রিয়াই—উহা মানুষেরই হউক, অথবা প্রকৃতিরই হউক—চিৎশক্তির প্রেরণা ভিন্ন হইতে পারে না, এই সত্য বিস্মৃত হওয়াই বহির্মুখীনতা।

৫। জীবের এই বহির্মুখীনতা এবং তাহা নিবারণের উপায়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলার বিশ হইতে চব্বিশ অধ্যায়ে সনাতন-শিক্ষা নামক অংশে বর্ণিত আছে। শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামী সংসার ত্যাগের পর শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়?" শ্রীমন্ মহাপ্রভু ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ঐ পাঁচ অধ্যায়ে আছে। উহার সার :—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস॥" ২।২০।১০১
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥ ২।২০।১০৪
সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ ২।২০।১০৬

সাধুশাস্ত্র কৃপাই ভগবৎ করুণা। জীব যে শ্রীকৃষ্ণকে ভোলে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম। ভগবৎ ইচ্ছাশক্তিরই প্রকাশ এই জ্ঞান না-থাকা। মায়াশক্তি এই অজ্ঞানের কারণ। জ্ঞান হইলে জীব বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতিতে যে সমস্ত নিয়ম জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সমস্ত নিয়ম ভগবানের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। এই জ্ঞান হইলেই জীবের ব্রজলীলায় প্রবেশের অধিকার হয়।

৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার রূপানুগ্রহ নামে ১৯ পরিচ্ছেদে আছে :—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

মালী হৈঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ ২।১৯।১৩৩-১৩৬

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ঠিক এইরূপ কথাই পাই—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮।৫৪-৫৫

জীব তখনই ব্রহ্মভূত হয়, যখন সে বুঝিতে পারে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ—

"তুঁহু জগন্নাথ জগমাহ কহায়সি
জগবাহির নহ মুই ছার।"

এই অবস্থায় জীবের শোক ও আকাঙ্ক্ষা সমস্ত দূর হইয়া আত্মা প্রসন্ন হয় এবং সর্ব্বভূত সমান জ্ঞানে পরাভক্তি লাভ হয়। এই ভক্তি দ্বারাই ভগবান যাদৃশ ও যাহা তাহা তত্ত্বতঃ জানা যায়। এইরূপ জ্ঞান হইলে জীব ভগবানে প্রবেশ করে। ইহাই জীবের ব্রজলীলায় প্রবেশ। ইহার পর জীবের শ্রীমদ্-ভাগবতীয় ব্রজলীলার আস্বাদন হইতে থাকে। শক্তিমানের সহিত তাঁহার স্বরূপ শক্তির লীলা আস্বাদন করিতে হইলে প্রথমতঃ ব্রহ্মভূত হইতে হইবে। সাধন-ভক্তির ফলে এই

অবস্থা হয়। প্রেমতত্ত্ব তখন স্বতঃই প্রকাশিত হয়, প্রেমময় হইয়া জীব ব্রজরস আস্বাদন করে।

৭। যে সাধন-ভক্তির ফলে জীব ব্রহ্মভূত হইতে পারে, তাহার প্রথম আরম্ভ হয় নৈতিক বিধি-নিষেধ মানিয়া সংযত-ভাবে জীবন যাপন করায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজ চিত্ত ও বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁহার উপদেশ মত নিজ ইষ্টদেবকে আরাধনা করায়। এই প্রণালীতে জীবন যাপন করিতে করিতে নিজ ইষ্টদেবের প্রতি রতি জন্মে। এই রতিই ইষ্টদেবে ভক্তির আরম্ভ। এই অবস্থায় নিজের কামনা বাসনা সমস্তই নিজ ইষ্টদেবের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অনুকূল হয়। তখন আর নিজের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুই-এর মধ্যে বিরোধ থাকে না। ঈশোপনিষদের ভাষায়, জীব তখন বুঝিতে পারে—'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু পরিবর্ত্তনশীল বিষয় ও বস্তু আছে, তৎসমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত। এই বুঝার ফলেই জীব 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্' উপদেশ পালনে সমর্থ হয়।

এই উপদেশই জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের মূলমন্ত্র। এই ভূমিকায় জীব বুঝিতে পারে যে, সমস্ত জগৎ একই তত্ত্ব দ্বারা চালিত হইতেছে। ব্যষ্টি একক জীবকে নিজের স্বরূপের আস্বাদন করিতে হইলে জগদ্ব্যাপ্ত ঐ এক তত্ত্বের সহিত নিজের সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। এই অবস্থায় অন্য কাহারও ধন লইবার আকাঙ্ক্ষা দূর হয়, এবং জীব ত্যাগের দ্বারাই আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

৮। যে এক সত্ত্বা দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে, তাহা রস ও করুণাত্মক প্রেম তত্ত্ব, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। ঐ প্রেমতত্ত্বেরই প্রকটরূপ ব্রজলীলা, ইহাও তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। প্রেমতত্ত্বে ব্রজলীলার সহিত জীবের সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্য্য করাই ব্রজলীলায় জীবের স্থান নির্দ্দেশ করে। ব্রজে স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের ক্রিয়ার অনুগত হওয়াই জীবের ব্রজ-লীলায় প্রবেশের উপায়। এই আনুগত্যই রাগানুগা ভক্তির মূল। শক্তিমানের সহিত স্বরূপ-শক্তির যে ক্রিয়া তাহাকে বলে রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তি উভয়ই অনুরাগমূলক। রাগাত্মিকা ভক্তিতে এই অনুরাগ নিত্যই আছে। রাগানুগা ভক্ত নিত্য রাগাত্মিকা ভক্তের অনুগত হইয়া কার্য্য করিতে করিতে রাগাত্মিকা ভক্তের ভাব, স্বভাব ও ক্রিয়া লাভ করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তির নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে :—

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তি 'রাগানুগা' নামে॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা 'রাগ' এই স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা এই তটস্থ লক্ষণ॥ ২।২২।৮৫-৮৬

লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥ ২।২২।৮৮

এই উভয়বিধ ভক্তির সার শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় তৃষ্ণা অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর দৃঢ় আকর্ষণ। এই আকর্ষণ শাস্ত্রোপদেশ

বা যুক্তি তর্কের অপেক্ষা রাখে না। তাই বলিয়া এই আকর্ষণের শাস্ত্রোপদেশের সহিত কোন প্রতিকূলভাব নাই।

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ ২।২২।৮০

উভয়ের পার্থক্য কর্ম্মের প্রেরণায়। রাগানুগা ভক্তের কর্ম্মের প্রেরণা অনুরাগমূলক। বৈধী ভক্তের কর্ম্মের প্রেরণা শাস্ত্রশাসন। রাগানুগাভক্তিতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই এক হইয়া যায়। বৈধী ভক্তিতে প্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়ঃ এর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৯। রাগানুগাভক্তির একটি দৃষ্টান্ত শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজগোপীগণের দিব্যোন্মাদ ভাব দেখিয়া যে-ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাতে পাই।

উদ্ধব মহাশয় ব্রজগোপীদের ভাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, রাসোৎসবে ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া ব্রজগোপীদের যে প্রসাদ প্রাকট্যলাভ করিয়াছিল, তাহা আর কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। এমন কি শ্রীনারায়ণের নিত্য পদসেবিকা লক্ষ্মীরও হয় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উদ্ধব মহাশয়ের এই উক্তির উল্লেখ করিয়া যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে :—

প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব আকর্ষণ॥

ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি ভাবে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্র জ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ তাঁরে সখা জ্ঞানে জিনি' চড়ে কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি ;—নিজ সম্বন্ধ মনন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২।৯।১১৭—১২১

উদ্ধব মহাশয় ব্রজগোপীগণের এই ভাগ্যের কথা বলিয়াই প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তিনি যেন গোপীদের চরণরেণু-সেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্মলতা হইতে পারেন। সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ১০।৪৭।৫৬

উদ্ধব মহাশয়ের প্রার্থিত বৃন্দাবনস্থ গুল্মলতা প্রভৃতি ওষধির মধ্যে কোন একটি হইতে পারিলে কি হইবে সেই লালসা প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি প্রার্থনাময়ী গীতিকায় ব্যক্ত—

বিধি যদি গুল্মলতা করিত রে কুঞ্জবনে।
সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আভরণে॥
নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে সখীসনে অভিসারে
এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে॥
হাতে বাঁশী কালশশী নিকুঞ্জ কাননে পশি
সুখে রহিতেন বসি মমোপরে প্যারী সনে॥

ক্রীড়াশ্রমে রাধাশ্যাম ঘামিতেন অবিরাম
অমনি পদের ঘাম লইতাম সযতনে ॥
বন্ধু বলিছে কাতরে কবে রাধা দামোদরে
সাজাব হৃদয় ভরে হেরিব প্রেম নয়নে ॥
ব্রজলীলায় জীবের এই-ই স্থান।

১০। উপনিষদের যে সমস্ত মন্ত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই ব্রজলীলায় জীবের স্থান অনেকটা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ প্রায় প্রতি উপনিষদেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই জীবাত্মা যে বহির্মুখ, তাহা কঠোপনিষদে চতুর্থ বল্লীর প্রথম মন্ত্রে উল্লেখ আছে। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ" খানি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ স্বয়ম্ভূ "পরাঞ্চি ব্যতৃণৎ" অর্থাৎ বহির্মুখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা মায়াশক্তির ক্রিয়া সূচিত হয়। তাহার পরেই ঐ মন্ত্রে আছে :—
"তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

ইহাদ্বারা জীব মায়ার অধীন হইয়া বহির্মুখ হয়, তাহা বুঝা যায়। এই বহির্মুখতা নিবারণের উপায় উক্ত মন্ত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে আছে :—

'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।'

শঙ্কর 'প্রত্যগাত্মা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ব্যাপক চৈতন্য। সুতরাং এই মন্ত্রে বলা হইতেছে, যে-জীব ব্যাপক চৈতন্যকে সাক্ষাৎ করিয়া অমৃতত্ব ইচ্ছা করে, সে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে আবৃত করিবে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া প্রত্যগাত্মাতে নিয়োজিত করিবে। ইহাই জীবের কৃষ্ণোন্মুখী

হওয়া। ঐ উপনিষদে ঐ বল্লীর তৃতীয় মন্ত্রে যাঁহাকে পূর্ব্বে প্রত্যগাত্মা বলা হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে :—

'যেন রূপং রসং গন্ধংশব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে এতদ্বৈ তৎ।'

এই মন্ত্রে বলা হইল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মৈথুন-জনিত সুখ যে জীব অনুভব করে, তাহা সমস্তই "এতেনৈব" অর্থাৎ আত্মাদ্বারা সংগঠিত হয়—তাহা জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা ইহাই—এতদ্বৈ তৎ। আচার্য্য শঙ্কর এ মন্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "যাহাকে জানিলে পর আর কিছু জানার থাকে না, তাহাকে জানা যায় কি উপায়ে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, সমস্ত লোক সেই বিজ্ঞান স্বরূপ আত্মাদ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শ ও মৈথুন জনিত সুখানুভূতি বিস্পষ্টরূপে জানিতে পারে। আচার্য্য শঙ্কর এই ভাষ্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনই যে জীবের স্বরূপ তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। শ্রুতি জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে ইহা বলিয়া পরে দশম ও একাদশ মন্ত্রে বলিতেছেন :—

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুংগচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
এতদ্‌বৈ তৎ॥

এই দুইটি মন্ত্রে সৃষ্টিতে বহুত্ব ও নানাত্ব অস্বীকৃত হওয়ার কথা

আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব, মন্ত্র বিশেষতঃ 'যেন রূপং রসম্' ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্রটির সহিত এই দশম ও একাদশ মন্ত্র একত্রিত করিয়া চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, আত্মা হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র 'বহু' ও 'নানার' অস্তিত্ব নাই। আত্মার সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইলে বহু ও নানার অস্তিত্ব আছে—শঙ্কর ভাষ্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। শঙ্কর বলিতেছেন—'ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ববস্তুতে অবস্থিত এবং বিভিন্ন উপাধিযোগে অ-ব্রহ্মভাবে প্রতীয়মান যে সংসারী বা জীব চৈতন্য, সেই সংসারিচৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ এইরূপ কাহারও আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে এই দশম মন্ত্র শ্রুতিতে আছে। একাদশ মন্ত্রে যে 'মনসা এব ইদমাপ্তব্যম্' উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারা শাস্ত্র বাক্য, গুরূপদেশ, নিজের বিবেক বুদ্ধি সমস্ত সূচিত হইতেছে।

১১। প্রকৃতি ও জীবের ব্রহ্ম ব্যতীত যে কোন স্বতন্ত্রতা নাই, অর্থাৎ জীবকে যে নিত্য কৃষ্ণদাস উল্লেখ করিয়াছি একমাত্র বশীর বশ্যতাপন্ন জীব, তাহা সমস্ত উপনিষদেই সমর্থিত। কঠোপনিষদের পঞ্চম বল্লীর নবম, দশম ও একাদশ মন্ত্রে অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃত শক্তি এক এবং অদ্বিতীয় সর্ব্বভূতান্তরাত্মার "রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ" বলিয়া দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, "সেই একবশী অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ও জীব যাহার বশে আছে, সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মাকে যে নিজের ভিতরে দেখিতে পায়, সেই শাশ্বত সুখ পায়।" তিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনারও চেতন এবং এক হইয়াও বহু এবং বহুর কাম্যবস্তুর বিধান

করেন। জীব যেখানে সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মাতে মিলিত হয়, সেখানে—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ৫।১৫

এই স্থানই ব্রজলীলার গোলোক-বৃন্দাবন। ইহারই ঠিক অনুরূপ মন্ত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে এবং আরও আছে।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

কঠোপনিষদে আছে যে, এই একবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মার শাসনে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দেয় এবং বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও ঠিক ঐ কথাই আছে।

১২। এমনকি দেবগণেরও যে এই একবশী ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্রতা নাই। তদ্বিষয়ে কেন-উপনিষদে তৃতীয় খণ্ডে একটি হৃদয়গ্রাহী উপাখ্যান আছে। দেবগণ একদা অসুর জয়ে নিজেদের শক্তির অভিমানী হইয়াছিলেন। তখন সমস্ত দেব ও জীবের মধ্যস্থিত শক্তি এক যক্ষরূপে আবির্ভূত হন। দেবগণ উঁহাকে জানিতে না পারিয়া জাতবেদ অগ্নিকে ঐ যক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসায় অগ্নি বলিলেন—এই পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ আছে তিনি সমস্তই দগ্ধ করিতে পারেন। যক্ষ এক গাছি তৃণ দিয়া দগ্ধ করিতে বলিলে অগ্নি তাঁহার সমস্ত তেজ দ্বারা উহা দগ্ধ করিতে না পারিয়া দেবগণের

নিকট ফিরিয়া গেলেন। তৎপর মাতরিশ্বা বা বায়ু প্রেরিত হইয়া নিজ পরিচয় দিলে অনুরুদ্ধ হইয়া এক গাছি তৃণও সমস্ত শক্তি প্রয়োগে উড়াইতে অসমর্থ হইলেন। এইরূপে সমস্ত দেবগণের ঐ যক্ষের সান্নিধ্যে নিজ শক্তি লোপ হইল। পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র তথায় বহু শোভমানা হৈমবতীকে আবির্ভূতা দেখিলেন। তাঁহাকে ঐ যক্ষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন—

সা "ব্রহ্মেতি" হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি, ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ কেন—৪।১

উপনিষদের এই সব মন্ত্র দ্বারা প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণই যে সৃষ্টি সংসারের অধীশ্বর' তাহা সমর্থিত হয়।

১৩। প্রভুর এই বাণীতে আরও আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত চৈতন্যময় তুরীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ধ্যেয় বস্তু। এ বিষয়ে কেনোপনিষদে ব্রহ্মের সহিত জীবাদি চিদ্বস্তুর সম্বন্ধ থাকা এবং তদ্দ্বারাই সমস্ত চিদ্‌বস্তু পুষ্টি লাভ করার কথা দেখিতে পাই। ঐ উপনিষদে শান্তিপাঠে জীবের সমস্ত বাক্, অঙ্গ, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয় সমূহ উপনিষদ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম দ্বারা পুষ্টি লাভ করে বলিয়া ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—

তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু। তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ।

এই শান্তি পাঠে উল্লিখিত ব্রহ্ম ও জীবের নিত্য সম্বন্ধই ব্রজ-লীলার দাস্যভাব। ঋষি এই শান্তি পাঠ করিয়াই চিন্তা করিতেছেন :—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥ কেন ১।১

জীব প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া ও কার্য্য নিয়ত দেখিতে দেখিতে উহার 'কেনত্ব' বিস্মরণ হইয়াছে। ইহাই বহির্মুখতা—এই 'কেন'র যে উত্তর পরবর্ত্তী মন্ত্রে ঋষি দিয়াছেন, তাহার আস্বাদন করিলে ধ্যেয় বস্তুর প্রতি রতি জন্মে।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ কেন—১।২

এই মন্ত্রটিতে বলা হইয়াছে যে, জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি করণ বর্গ দ্বারা ব্রহ্মই সমস্ত উপভোগ করিতেছেন—ইহা বোধ হইলেই জীবের অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়। এই বোধই জীবের ধ্যান। কেনোপনিষদের প্রথম খণ্ডে পঞ্চম হইতে নবম মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম বাক্যে প্রকাশিত হন না, পরন্তু তাঁহার জন্যই বাক্য উচ্চারিত হয়—তাঁহাকে মন দ্বারা চিন্তা করা যায় না, কিন্তু তিনি মনকে উদ্ভাসিত করেন—তাঁহাকে চক্ষুঃ দ্বারা দেখা যায় না, অথচ তাঁহার দ্বারাই চক্ষুঃ দর্শন করে—তাঁহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার জন্যই শ্রবণ করে—ঘ্রাণ দ্বারা তাঁহাকে আঘ্রাণ করা যায় না, কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তিনি স্ববিষয়ে প্রেরণ করেন। এই সমস্ত

বলিয়াই ঋষি বলিতেছেন—'তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি' কেন—১।৯

১৪। পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রে ব্রহ্মকে জানার মন্ত্র আছে। তাহাতে প্রশ্ন উঠে যে ব্রহ্মের রূপ কী? কেনোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, যিনি মনে করেন যে, তিনি 'ব্রহ্মণঃ রূপং বেত্থ' ব্রহ্মের রূপ জানেন তাঁহার জানা ঐ রূপটি 'দভ্র' অর্থাৎ অল্প। কেন—২।১

যিনি ব্রহ্মকে জানি, ইহা মনে করেন না এবং জানি না ইহাও মনে করেন না, তিনিই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। ইহা বলিয়াই ঋষি যে শাশ্বত মন্ত্রটি বলিয়াছেন, তাহাই জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্বরূপ প্রকাশক। সে মন্ত্রটি এই :—

প্রতিবোধ বিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥

কেন—২।৪

ইহার ভাবার্থ এই যে, জীবের প্রতিবোধেই ব্রহ্মের বোধ, এই বোধেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অমৃতের আস্বাদন তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীর সপ্তম অনুবাকে 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি' যে মন্ত্রটি আছে, তাহারই অনুরূপ। ইহাই কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন। এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াই শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন ঝারি খণ্ডের বনপথে শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছিলেন, তখন ব্যাঘ্র ও ভল্লুকাদিতে তাহাদের হিংস্র মূর্ত্তি দেখেন নাই। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি" হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর কেনোপনিষদের এই মন্ত্রের 'প্রতিবোধ' শব্দের অর্থ করিতে বলিয়াছেন—ঘটপটাদি বিষয়ক বুদ্ধি বৃত্তিতেই

অর্থাৎ সেই প্রত্যয় ও বোধের দ্বারাই সেই আত্মা প্রকাশকরূপে বিদ্যমান আছেন। শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে, শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম বিদিতও নহেন, অবিদিতও নহেন। তিনি তদুভয় স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিদিত ও অবিদিত বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ-সম্ভূত জ্ঞান বা অজ্ঞান অর্থে ব্রহ্ম তাহার কোনটারই বিষয় নহেন। ব্রহ্ম যে 'প্রতিবোধবিদিতম্' তাহা তাঁহার স্বপ্রকাশত্বগুণে। মহাপ্রভুর স্থাবর জঙ্গম দেখিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান হইত, উহা বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জন্য জ্ঞান নহে। রাগানুগাভক্তের কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তিই জীবের ব্রজলীলায় প্রবেশের দ্বার।

১৫। মায়াকর্ত্তৃক জীবের কৃষ্ণ বহির্মুখ হওয়া ঈশোপনিষদেও পাওয়া যায়। উহার প্রথম মন্ত্রে জগৎ "ঈশা বাস্যম্" পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। উহার পঞ্চদশ মন্ত্রে আছে :—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

এই মন্ত্রের উল্লিখিত হিরণ্ময় পাত্র মায়ার প্রলোভন। এই প্রলোভন দূর হইলে সত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রজলীলায় প্রবেশ করা যায়। তখন—যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। ঈশ—১৬

তখন আরও জানা যায় :—

যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ঈশ—১৬

এই মন্ত্রে সোঽহং বাক্যটি কল্যাণতম রূপ দেখার সহিত একত্রে চিন্তা করিলে 'অহম্'—'সঃ' পদবাচ্য পুরুষের সহিত সম্বন্ধ দ্বারা এক, ইহাই বুঝা যায়। "অহম্" ইহা "সঃ" তে লোপ হইলে

'সঃ'য়ের কল্যাণতম রূপ দেখা সম্ভব নহে। সেইজন্য "সঃ"-এর সহিত "অহংম্" এক সম্বন্ধে মিলিত হইলেই পরস্পরের রস আস্বাদন লোপ হয় না, পরন্তু বৃদ্ধি হয়।

১৫। ছান্দোগ্যোপনিষদের আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে যে "তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" বাক্য আছে, ঐ বাক্য যে যে মন্ত্রের সহিত যুক্ত আছে, তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, জগতের যত কিছু আছে, তৎসমস্তই সত্য আত্মার সহিত যুক্ত এবং শ্বেতকেতুও ঐ জগতের একজন জন্য, সেও তাহাই। ঐ সব মন্ত্রে স্বপ্নান্তে সুষুপ্তি এবং জাগ্রত, অশনা, পিপাসা, অন্ন, জল, তেজ, রস, রুধির ইত্যাদির রূপ এবং জীব ও পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া ইহা সমস্তই এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিশেষে আছে :—

স যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎসত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ছাঃ— ৬।৮।৭

ইহার অর্থ :—ইদং (পূর্ব্ব-বর্ণিত দৃশ্যমান সমস্ত জগত) সঃ যঃ এষঃ অণিমা ঐতদাত্ম্যম্ (সৎ স্বরূপ অণিমারূপ ব্রহ্মের আত্মভূত)। তৎ সত্যং স আত্মা (সেই আত্মাই সত্য) তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো (শ্বেতকেতো তুমিও তাহাই)। এই মন্ত্রে প্রকাশ-শীল জগৎ ব্রহ্মের মায়ায় উদ্ভুত এবং জীবও ঐ জগতে থাকিয়া ব্রহ্মের সহিতই যুক্ত, ইহাই বলা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর এই মন্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, এই সৎ স্বরূপ আত্মার দ্বারাই এই সমস্ত জগত আত্মবান্ , সত্তাবান্ , সৎ।

বিদ্যাপতির একটি গীতে আছে :—

তুঁহ জগন্নাথ জগমাহ কহায়সি
জগছাড়া নহ মুই ছার।

এই গীতের সহিত তত্ত্বমসি মন্ত্রের, আচার্য্য শঙ্কর যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহার কোন অসঙ্গতি নাই।

১৭। পিতা আরুণির এই উক্তি শুনিয়া পুত্র শ্বেতকেতু পুনঃ পুনঃ অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে থাকায় ঋষি আরুণি দৃশ্যমান জগতের সহিত সৎস্বরূপ অণিমারূপ ব্রহ্মের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষ যে দৃষ্টান্তে শ্বেতকেতু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা এই—চোরাপবাদে অভিযুক্ত ব্যক্তি জ্বলিত লৌহখণ্ড ধৃত করিয়া দগ্ধ না হওয়ায়, অপবাদ হইতে মুক্ত হয়েন। মায়ার প্রলোভনে মোহগ্রস্ত জীবই এই দৃষ্টান্তে চোরাপবাদ গ্রস্ত ব্যক্তি। সে যখন জ্বলিত লৌহখণ্ডরূপ সত্য-গ্রাহী হয়, অর্থাৎ সৎকে আশ্রয় করিয়া নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে, তখন মায়ারূপী অপবাদ তাহাকে ত্যাগ করে।

এই শেষ দৃষ্টান্তের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৃষ্টান্তগুলিতে জীবের 'আমিই সব' এইরূপ অহঙ্কার দূর হইয়া শান্তভাব প্রাপ্তি; তাহার পর জীবের শ্রদ্ধালাভ; এবং তাহাব পর জীব নিজ পথ দেখিতে পাইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে নিজ সৎস্বরূপকে সাক্ষাৎ পায় এবং তাহার সহিত নিত্য সম্বন্ধে মিলিত হয়। এইরূপ বেশ একটি ক্রম লক্ষিত হয়। "আমিই সব" এই অহঙ্কার দূর হওয়ার চারটি দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম দৃষ্টান্ত মধুমক্ষিকা কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের পুষ্প রসকে এক করিয়া যে মধু প্রস্তুত হয়, তাহাতে ভিন্ন

ভিন্ন রসের পৃথকত্ব থাকে না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নদীসমূহ উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্য দিয়া সমুদ্রে মিলিত হইলে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য চলিয়া যায়। তৃতীয় দৃষ্টান্তে বৃক্ষের শাখাদি ভিন্ন অংশে শুষ্ক হইয়া বৃক্ষ মরিলেও বীজাকারে উহার সত্তা বর্ত্তমান থাকে, এবং ঐ বীজেতেই সমগ্র বৃক্ষটি অবস্থিত, শ্রদ্ধা হইলে জানা যায়। ইহার পর লবণাক্ত জলে বিদ্যমান লবণের ন্যায় জীবদেহে সদ্‌বস্তু বর্ত্তমান থাকার দৃষ্টান্ত আছে। এই চারিটি দৃষ্টান্তে জীবের অহঙ্কার জনিত যে স্বাতন্ত্র্য বোধ, তাহা অলীক ইহাই দেখান হইল।

তাহার পর শ্রদ্ধার কথা আছে। শ্রদ্ধার দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে বদ্ধ-চক্ষু কোন ব্যক্তিকে দূর দেশে লইয়া ছাড়িয়া দিলে কোন করুণাবান্ ব্যক্তি যদি তাহার চক্ষু খুলিয়াদেন, সে যেমন কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ দেশে ফিরিতে পারে, তদ্রূপ জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে শাস্ত্র ও গুরূপদিষ্ট পথে নিজধামে যাইতে পারে। ইহার পরই শেষ দৃষ্টান্তে পূর্ব্ব দৃষ্টান্তটি আছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, জীব সত্ত্বে প্রবেশ করিলে তাহার বাক্, মনেতে ; মন, প্রাণেতে ; প্রাণ, তেজে এবং তেজ, পরদেবতাতে যুক্ত হয়। এই দৃষ্টান্তগুলি জীবের স্বরূপ এবং তাহার ব্রজলীলায় যে স্থান উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার আনুকূল্যে প্রযুক্ত হইতে পারে।

১৮। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে মুণ্ডকোপনিষদে তৃতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ড ও প্রথম মন্ত্রেতে আছে যে, উভয়ই 'সযুজা সখায়া'। উভয়েই দেহরূপ বৃক্ষে "সুপর্ণা" রূপে, জীব

"পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি। ব্রহ্ম 'অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি'। শঙ্কর ভাষ্যে 'সুপর্ণা' অর্থ নিয়ম্য নিয়ামক ভাব প্রাপ্তিরূপ উত্তম পক্ষ সম্পন্ন পক্ষী এবং 'সযুজা' অর্থ একসঙ্গে সম্মিলিত। উভয়ই সখা ভাবে থাকিলেও জীব সুস্বাদু পিপ্পল ফল ভক্ষণ করেন, ব্রহ্ম রাজার ন্যায় কেবল তাহা দর্শনই করেন। আচার্য্য শঙ্করের এই ভাষ্যে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ সম্রাট ও প্রজা অর্থাৎ সেব্য ও সেবকের ন্যায়। জীবের সুস্বাদু ফল ভক্ষণরূপ নিজের কর্ম্মফল ভোগের যে আনন্দ তাহা ব্রহ্মের দর্শনে অর্থাৎ প্রেরণায় সম্ভব হইতেছে। কিন্তু তাহা যতদিন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অহঙ্কার বশতঃ জীবের নিজকর্ত্তৃতাভিমান থাকিবে ততদিন জীব "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।" মু—৩।১।২

ইহার অর্থ শঙ্করভাষ্যে আছে—"আমার পুত্র নষ্ট হইয়াছে" "ভার্য্যা মারা গিয়াছে" "আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি ?" এই প্রকার দীন ভাবের নাম অনীশা। এই অনীশা বশতঃ মুহ্যমান লইয়া অবিবেক নিবন্ধন বহুবিধ অনর্থরাশি দ্বারা জীব-হৃদয় দুচিন্তাগ্রস্ত হয় ও শোক করিয়া থাকে। ইহার পরেই শ্রুতিতে আছে ঃ—

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ
মস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ মুঃ ৩।১।২

'ইহার অর্থ শঙ্কর ভাষ্যে আছে, যে কোন দয়ালু পুরুষ হইতে উপদেশ লাভ করিয়া জীব যখন বুঝিতে পারে যে, এই জগত পরমেশ্বরেরই মহিমা, তখন সে স্বীয় স্বরূপের সাক্ষাৎ পায় ও

বীতশোক হয়। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে কঠ ও অন্যান্য প্রায় সমস্ত উপনিষদেই অনুরূপ উক্তি আছে।

১৯। ব্রহ্ম ও জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ যে মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন তাহাও সমস্ত উপনিষদে পাওয়া যায়। ঐ মায়া দূর হওয়ার উপায় জ্ঞান—উপনিষদ পড়িয়া ইহাই অনেকের ধারণা হয়। জ্ঞান অর্থ যদি বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়, ঐ জ্ঞানদ্বারা যে মায়ামুক্ত হওয়া যায় না তাহাও সমস্ত উপনিষদেই আছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, যে-জ্ঞানে মায়ামুক্ত হওয়া যায়, তাহা কিরূপ জ্ঞান? ইহার উত্তর পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এই হয় যে, জীবের নিজ-স্বরূপ জ্ঞানই মায়ামুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়। রাজা, প্রজা, প্রভু, ভৃত্য, সেব্য, সেবক ইত্যাদি সম্বন্ধ ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধের পরিচায়ক, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে রাজা, প্রভু বা সেব্যের প্রতি প্রজা ভৃত্য বা সেবকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। এই কর্ম্মের প্রেরণা একাধিক রকমে হইতে পারে। জীব নিজকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া যে কর্ম্ম করে, তাহা মায়ার প্রেরণায় কাম্যকর্ম্ম। শাস্ত্রোপদেশ মত যে কর্ম্ম করে, তাহা বিধিনিষেধ অনুযায়ী বৈধকর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্ম ইহারই অন্তর্ভূক্ত। এই দুই প্রকার ব্যতীত অনুরাগ বশতঃ যে কর্ম্ম, তাহাই প্রকৃত ভক্তির কর্ম্ম। সাধারণতঃ সমস্ত কর্ম্মেই অল্পবিস্তর এই তিন রূপ প্রেরণা আছে। বৈধকর্ম্ম করিতে করিতে যদি কখন কাহারও নিজ স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ অনুযায়ী রতির উদয় হয়, তখন তাহার কর্ম্মের প্রেরণা যে অনুরাগ, তাহা বুঝিতে পারি।

তাহার পর অনুরাগমূলক কর্ম্ম করিতে করিতে নিজ স্বরূপের সহিত জীবের সাক্ষাৎ হয়। এই বিষয়ে বিভিন্ন উপনিষদের মন্ত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

কঠোপনিষদে আছে ঃ—

অন্যচ্ছে য়োহন্যতুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥ কঠ ২।১

এই মন্ত্রে শ্রেয়ঃ অর্থ বৈধ ভক্তিমূলক কর্ম্ম। প্রেয় অর্থ জীবের নিজ প্রীত্যর্থে সকাম কর্ম্ম। শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ উভয় কর্ম্মেই জীবকে নানার্থে নিয়োজিত করে। যিনি প্রেয় কর্ম্ম করেন, তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হন।

২০। এই শ্রেয়ঃ কর্ম্ম বিষয়ে কঠোপনিষদে তৃতীয় বল্লীতে জীবের শরীরকে রথ জীবাত্মাকে রথী বুদ্ধিকে সারথী, মনকে লাগাম, ইন্দ্রিয়বর্গকে অশ্ব বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে ঃ—

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ কঠ ৩।৬

কিন্তু ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনাই নিজস্বরূপ আস্বাদনের শেষ নহে। স্বরূপ আস্বাদনে আরও কিছু চাই। তৎসম্বন্ধে কঠোপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন, যিনি "অজ নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ" এবং যিনি "আসীনো দূরং প্রজাতি শয়নো যাতি সর্ব্বতঃ" এবং "অশরীরং শরীরেষনববস্থেষবস্থিতং, মহান্তং বিভুং" সেই

প্রণবরূপী আত্মা, তিনি 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য। স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণতে তনুং স্বাম্॥

এই সমস্ত মন্ত্রের আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক বৃত হইয়া পুনঃ তাহাকে বরণ করাই রাগানুগাভক্তির কার্য্য। ইহাতে শ্রেয় ও প্রেয়, চৈতন্য ও জড় এক হইয়া যায়। প্রভুর কার্য্যেতেই ভৃত্য নিজ স্বরূপ-আনন্দ লাভ করে। প্রশ্নও অন্যান্য উপনিষদে অনুরূপ মন্ত্র আছে।

২১। ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্গীথ ভক্তি উপাসনার উল্লেখ আছে। এই উপাসনায় বিশেষ বিশেষ বস্তুকে উদ্গীথ নামক ওঁকার অক্ষরকে উদ্গীথ ভক্তিরূপে পূজা করা হয়। পূজনীয় বস্তুই এই ভক্তি উপাসনার ফল প্রদান করিয়া থাকেন। একদা দেবাসুর যুদ্ধে এইরূপ উদ্গীথ ভক্তি উপাসনা দ্বারা দেবগণ অসুরগণকে জয় করার চেষ্টা করেন। দেবগণ ক্রমে নাসিকা, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া উদ্গীথ ভক্তির উপাসনা দ্বারা অসুরগণকে পরাভব করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অসুরগণ ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই পাপবিদ্ধ করিতে পারিয়াছিল। তাহার ফলে নাসিকা সুগন্ধি দুর্গন্ধি বস্তু উভয়ই আঘ্রাণ করে; বাক্ সত্যমিথ্যা উভয়ই বলিয়া থাকে, চক্ষু প্রিয় অপ্রিয় উভয়ই দর্শন করে; শ্রোত্র ভালমন্দ উভয় সুরই শ্রবণ করে; মনঃ সুচিন্তা কুচিন্তা উভয়ই করিয়া থাকে। এইরূপে দেবগণ পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়বর্গকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপাসনা দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে "অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমু

পাসাঞ্চক্রিরে" প্রাণকে উদ্গীথ কার্য্যের জন্য উপাসনা করিয়াছিলেন।

২২। মুখ্য প্রাণই যে প্রেম, তাহা আচার্য্য শঙ্কর পরবর্ত্তী মন্ত্রে ব্যাখ্যায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। এই পরবর্ত্তী মন্ত্রে আছে ঃ—

নৈবেতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষঃ।
তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি ॥

ইহার অর্থ ; এই মুখ্য প্রাণ অপহতপাপ্মা অর্থাৎ দোষ-শূন্য। সেই জন্য ইহাতে ভালমন্দ বিপরীত ভাব নাই। ইহার ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, যে, যেহেতু ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গ কল্যাণলাভে আসক্ত, সেই কারণে তাহারা 'আত্মম্ভরি,' অর্থাৎ নিজ পোষণে রত ; কিন্তু মুখ্যপ্রাণ আত্মম্ভরি নহে, পরন্তু সকলের পরিপোষণে রত। মুখ্যপ্রাণ ঘ্রাণাদি করণবর্গকে রক্ষা বা পালন করে, অর্থাৎ তাহার দ্বারাই অপর করণবর্গের অবস্থিতি হইয়া থাকে। অতএব মুখ্যপ্রাণ "সর্ব্বম্ভর" অর্থাৎ সকলের পোষক এবং সেই জন্যই তৈত্তিরীয় উপনিষদে "রসো বৈ সঃ" মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন, একই উদ্দেশ্যে জড় বর্গের যে সংহনন বা সম্মিলিতভাবে কার্য্য, তাহা কখনই কোন অসংহত চেতন পদার্থের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। এই অসংহত চেতন পদার্থের স্বরূপই আনন্দ। ছান্দোগ্যোপনিষদে 'মুখ্য প্রাণের' শঙ্কর ভাষ্য এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'রসো বৈ সঃ" মন্ত্রের ভাষ্য একত্র চিন্তা করিলে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, মুখ্য প্রাণই আনন্দময় রস অর্থাৎ প্রেমতত্ত্ব।

২৩। প্রশ্নোপনিষদে দ্বিতীয় প্রশ্নে আছে যে, প্রসিদ্ধ দেবতা সকল, যথা—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ, তাঁহারা প্রকাশ করিয়া অভিমান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, আমরাই এই শরীরকে দৃঢ়তর করিয়া বিশেষ প্রকারে ধারণ করিতেছি। তাহাতে বরিষ্ঠ প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ বলিলেন,—তোমরা মোহ-প্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ ঐরূপ অভিমান করিও না। কারণ আমিই নিজকে প্রাণাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে ধারণ করিতেছি। কিন্তু এ কথায় বাগাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত প্রাণগুলি শ্রদ্ধাবান্ হইল না, এবং নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে মুখ্যপ্রাণ উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম করিতেই অপর সকল প্রাণও উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইল ; এবং মুখ্যপ্রাণ পুনরায় স্থির হইলে অন্য প্রাণ সম্পূর্ণ সুস্থির হইল। ইহাতে মুখ্যপ্রাণের মাহাত্ম্য দর্শনে অন্যান্য প্রাণ মুখ্য প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহাই জীবের মায়ামুক্তি। প্রশ্নোপনিষদে তৃতীয় প্রশ্নে আছে,—'কুত এষ প্রাণো জায়তে' ?

তাহার উত্তরে আছে ঃ—

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষেচ্ছায়া।
এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে ॥ প্রঃ—৩।৩

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা হইতে এই প্রাণের জন্ম। আলোতে ছায়ার ন্যায় প্রাণ এই আত্মার সহিত যুক্ত। মনের কৃতকার্য্যদ্বারাই প্রাণ এই শরীরে আগমন করে। ইহাতে বুঝা যায় এই যে, আত্মারই পরিচ্ছিন্ন অংশ প্রাণরূপে শরীরে

অবস্থিত। এই তৃতীয় প্রশ্নের পরবর্ত্তী মন্ত্র সমূহে মুখ্যপ্রাণকে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান নামে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া সংহতভাবে কর্ম্ম করার কথা উল্লেখ আছে। অধিদৈবত-রূপে আদিত্যকে প্রাণ, পৃথিবীকে অপান, আকাশস্থ বায়ুকে সমান, তেজকে উদান, এবং সাধারণ বায়ুকে ব্যান বলিয়া প্রকৃতির সহিত জীব শরীরে সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। ইহা মায়াশক্তির সহিত জীবশক্তির সম্বন্ধ-সূচক। এই উভয় শক্তি আত্মারই প্রকার, ইহাও এই মন্ত্রে বুঝা যায়।

২৪। জীব মায়ামুক্ত হওয়ার বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত মহর্ষি সনৎকুমার ও দেবর্ষি নারদ সংবাদের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাসসংবাদের সাদৃশ্য বিদ্যমান। দেবর্ষি নারদ সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও শোকতাপ মুক্ত হইয়া আনন্দলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিলে তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়া অমৃতত্বের আস্বাদ পান। শ্রীবেদব্যাসও নানাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া শান্তি না পাওয়ায় দেবর্ষি নারদের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে ভাগবতীয় বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। তারপর শ্রীবেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ রচনা করিয়া শান্তিলাভ করেন। মহর্ষি সনৎকুমারের উপদিষ্ট ভূমা-বিদ্যা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এখন জীব কি প্রকারে সেই ভূমা-স্বরূপ ব্রজলীলায় স্থান পায়, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই আলোচনা করিব।

২৫। মহর্ষি সনৎকুমার একে একে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাহারই উপাসনা করিতে বলিলে দেবর্ষি নারদ তাহা হইতে উন্নততর তত্ত্ব আছে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। মহর্ষি সনৎকুমার ক্রমে নাম, বাক্, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, অপ্, তেজ, আকাশ, স্মর ও আশা বলিয়া সর্ব্বশেষে প্রাণই পরমতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। প্রাণতত্ত্ববিষয়ে সপ্তম অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ডে যাহা বর্ণিত আছে, তাহাতে 'প্রেম' অর্থে 'প্রাণ'শব্দ ব্যবহৃত হওয়া বুঝা যায়।

প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্; যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা
এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতম্; প্রাণঃ প্রাণেন যাতি
প্রাণঃ প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণো হ পিতা প্রাণো
মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ।

ছাঃ—৭।১৫।১

রথচক্রের শলাকাসমূহ যেরূপ চক্রের নাভিগর্ত্তে অর্পিত থাকে, তদ্রূপ প্রাণেতেই সমস্ত সমর্পিত আছে। তজ্জন্যই প্রাণ নিজশক্তিতে গমন করিতে পারে, নিজ শক্তিতে বিস্তৃত হইতে পারে, এবং নিজ শক্তিতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য্য, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যুক্ত হইতে পারে—ইহাই এই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ শক্তিযুক্ত তত্ত্বই আনন্দরসাত্মক প্রেমতত্ত্ব।

২৬। যে উপাসক এই প্রাণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাকে পরবর্ত্তী চতুর্থ মন্ত্রে 'অতীবাদী' বলিয়া পরবর্ত্তী ষোড়শ খণ্ডে প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, এই 'অতীবাদী' 'সত্যেনাতি বদতি'। ইহা শুনিয়া নারদ বলিতেন, "সোঽহং ভগবন্ সত্যেনাতি-

বদানীতি"। নারদের এইরূপ ইচ্ছা জানিয়া মহর্ষি সনৎকুমার, 'সত্যেনাতীবাদী' হওয়ার ক্রম যাহা ছান্দোগ্য সপ্তম অধ্যায়ে সপ্তদশ হইতে দ্বাবিংশ খণ্ডে দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন, তাহা ভক্তিমার্গের অনুরূপ। উহার প্রথম সোপান "যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি।" ইহাই সত্যাশ্রয় দ্বিতীয় সোপান 'যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি'—ইহাই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন। তৃতীয় সোপান "যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে॥" ইহাই শ্রদ্ধা। চতুর্থ সোপান "যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি"—ইহাই গুরু-আশ্রয়। পঞ্চম সোপান "যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি" ইহাই বৈধ-ভক্তি-অনুযায়ী ইন্দ্রিয় সংযমাদি। ষষ্ঠ সোপান "যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি, নাসুখং লব্ধ্বাবতরতি।" ইহাই রাগানুগা ভক্তি।

শঙ্কর এই শেষ মন্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, জগতে দৃষ্ট বা ঐহিক ফল-স্বরূপ পুত্রাদি জন্য সুখের উদ্দেশ্যে যেমন কৃতি বা যত্ন হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও অর্থাৎ আত্মসংযমেও সুখলাভ ব্যতীত কৃতি হইতে পারে না। শঙ্করের এই ভাষ্যে কথিত আত্মসংযমের সুখলাভ, ইহাই রাগানুগা ভক্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষা ও রূপানুগ্রহ নামক প্রকরণে যে বৈধভক্তির ও রাগানুগা ভক্তির আলোচনা আছে, তাহা মহর্ষি সনৎকুমারের এই সমস্ত উপদেশ দ্বারা সমর্থিত হয়। ইহার পর দেবর্ষি নারদ সুখ কি জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরে মহর্ষি সনৎকুমার "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং" এই শাশ্বত বাণীটি বলিয়াছিলেন। ভূমা কি নারদ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মহর্ষি ব্রজলীলার মূল মন্ত্রটি

অর্থাৎ "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন। ইহার আলোচনা ব্রজলীলা অধ্যায়ে করা হইয়াছে। রাগানুগাভক্তি সাধনের যে প্রণালী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এই আলোচনা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়।

২৭। এই ভক্তি সাধনের ফল যে জীবের ব্রজলীলায় স্থান পাওয়া, তাহা সপ্তম অধ্যায় পঞ্চবিংশ খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে উল্লেখ আছে ঃ—"অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্ম-রতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ;" ছাঃ—৭।২৫।২

এই মন্ত্রের সারার্থ এই যে উপাসক পূর্ব্ববর্ণিত রাগানুগাভক্তি সাধনে ভূমার আস্বাদ পাইলে আত্মা-রূপ ভূমাই সর্ব্বদিকে ও জগন্ময় দেখিতে পান, অর্থাৎ "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" তখন তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্ব স্ব-রূপে প্রকাশমান—স্বরাট্ হন। স্বর্গাদি সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার হয়। এই মন্ত্র দ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার যে বলিয়াছেন "কাম গায়ত্রী কাম বীজে তাঁর উপাসন" ইহা সমর্থিত হয়। মন্ত্রে উল্লিখিত আত্মমিথুন ও কামচার—ভূমার মিথুন ও ভূমার কাম এবং তাহা আত্মরতি আত্মক্রীড় ও আত্মানন্দ অর্থাৎ শক্তিমানের সহিত রাগাত্মিকা হ্লাদিনী শক্তির বিলাসে যখন জীব স্থান পায়, তখন তাহার ব্রজে বাস হয়। ইহাই জীবের ব্রজলীলায় স্থান।

২৮। এই স্থান পাইয়া জীবের নিজ ভজনানুযায়ী শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে তৎ তৎ বিষয়ের মাধুর্য্য আশ্রয়ে স্বরূপে আস্বাদন করার কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ঐ বর্ণনা প্রাকৃত সাংসারিক বিষয়ের ন্যায়ই। প্রভেদ এই যে, আত্ম-সাক্ষাতের পূর্ব্বেকার পৃথক জ্ঞানজনিত খণ্ডত্ব দূর হইয়া অভেদ জ্ঞানে পরিপূর্ণরূপে ঐ সমস্ত সম্বন্ধজনিত মাধুর্য্য নিত্য আস্বাদিত হয়। জীব তখন পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণানন্দ ও পরম মহত্ত্বের আস্বাদ পাইয়া তাহাতে চিরমগ্ন রহে। এই জন্যই ব্রজলীলা প্রাকৃত সৃষ্ট জগতের আদর্শ।

২৯। জীবের মায়ামুক্ত হওয়ার বিষয়ে নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ দিয়া আসিতেছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোকে বলিয়াছেন ঃ—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রাম রায়
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥

সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥ চৈঃ চঃ—৩।২০।৭-১১

এই শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন শব্দের 'চেতোদর্পণমার্জ্জনম্' বিশেষণটি বিশেষ উপযোগী। তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-ধাম সর্ব্বগ, অনন্ত; বিভু এবং নিত্য। তাই উহা জীবের নিকটতম বস্তু। মায়ার প্রলোভনে জীবের চিত্ত মলিন হওয়ায় নিকটতম বস্তুও ঐ চিত্তে ঢাকা পড়িয়া থাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনে চিত্ত দর্পণের এই মলিনতা দূর হয়। তাহাতে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম মঙ্গলরূপ চন্দ্রিকা দ্বারা কৈরব (কুমুদ) বিকশিত হয়, এবং পরা-বিদ্যারূপ যে বধূ তাহার জীবনের সঞ্চার হয় এবং আনন্দ সিন্ধু উথলিয়া উঠে এবং কৃষ্ণনামের প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন হয় ও শ্রীকৃষ্ণ নাম কৃপা করিয়া বাগিন্দ্রিয় বা জিহ্বায় আত্ম-প্রকট করে।

কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গুণ কৃষ্ণ লীলা বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ॥ ২।১৭।১৩০
তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভক্তি, প্রেমরূপ
নাম সংকীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দ স্বরূপ॥ ১।১।৫৪

কি প্রকারে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের অন্য একটি শ্লোকে বলিয়াছেন :—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

উত্তম হৈঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ॥
বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মইলে কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হৈঞা সেই কৃষ্ণ নাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ ৩।২০।১৭-২১

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

উর্দ্ধ বাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।
নাম সূত্রে গাঁথি কণ্ঠে পর এই শ্লোক ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ ১।১৭।২৮-২৯

৩০। শ্রীযুক্ত রূপগোস্বামী স্বরচিত বিদগ্ধ মাধব গ্রন্থে নাম-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

এই শ্লোক শুনিয়া নামের প্রকট-মূর্ত্তি ব্রহ্ম-হরিদাসের ভাব নিম্নের পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে।—

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি॥
কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মাধুরী ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি॥ ৩।১।১৮৯-৯০

এই শ্লোকটিতে প্রেমের মাধুর্য্য নামে অর্পিত হইয়াছে। প্রেমে যেরূপ কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, নামেও সেইরূপ যত শুনা যায়, ততই লোভ বাড়ে। নামটি যখন জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকে, বা কর্ণে শ্রুত হয়, তখন অসংখ্য জিহ্বা বা কর্ণ পাইবার আকাঙ্ক্ষা হয়। চিত্তে যখন নাম উদয় হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি লোপ পাইয়া একমাত্র নামই হৃদয়ে জাগিতে থাকে।

৩১। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং নামের এই বিরহ আস্বাদন করিয়া শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোকে বলিয়াছেন ঃ—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥ ৩।২০।১৩-১৫

নাম করিয়া "তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।" ইহাই এই শ্লোকে বুঝা যায়।

৩২। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর হরিনাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"হরিনাম শব্দ হরি ঠাকুরের নাম নহে।
গুরু গৌরাঙ্গ গোপী রাধা শ্যাম—সব মিলিয়া এক হরিনাম।
হরিবোল বল্‌লে সবই বলা হয়॥"

প্রভু আরও বলিয়াছেন :—

"হরিনামই রাই ঋণ"। রাসলীলার শেষে শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদিগের ঋণ কখন শোধ করিতে পারিবেন না বলিয়াছিলেন সেই ঋণ শোধের উপায়ই এই হরিনাম। শ্রীমতীর কৃষ্ণ বিরহে যে দশম দশা হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি তাঁহার 'নীলরতনকে' জগতে বিলাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ নাম মন্ত্র আজি লও সখীগণ" এবং দীক্ষার দক্ষিণা চাহিয়াছিলেন "সঙ্কীর্ত্তন প্রচারণ।" তাই প্রভু নিত্যানন্দ 'প্যারীর দশমী লয়ে' গৌর লীলায় 'নামে মত্ত' হন। এই সমস্ত তত্ত্ব শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর 'হরিকথা' গ্রন্থে প্রচার করিয়া গিয়াছেন; 'শ্রীশ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল' গ্রন্থে ইঁহার মধুর আস্বাদন দৃষ্ট হয়।

৩৩। প্রভু বন্ধুসুন্দরের একটি বাণীতে নামের বিরহ মর্ম্মন্তুদভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সে বাণীটি এই :—

"আমি কি তোদের কেউ নই? আমি কি ভেসেই যাব? আমায় কি হরিনাম দিয়ে কেউ রক্ষা করবে না? হায়! হায়!!

কেউ তো আমার কথা শুনে না। হরিনামও করে না। তোমরা আমার কথা রাখ, হরিনাম কর, আমি তাই শুন্‌তে শুনতে ধূলিতে, আকাশে, পৃথিবীর সমস্তে মিশিয়া যাই।”

“আমার শপথ, তোমরা সবাই হরিনাম কর। হরিনামের মঙ্গল হউক। তোমাদের মঙ্গল হউক। তা হ’লেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়।”

“তোমরা হরিনাম ক’রে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশায়ে লও। আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কা’রো নই।”—

—“হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু”—

৩৪। নামের এই মাহাত্ম্য উপনিষদ্ দ্বারা সমর্থিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম অধ্যায় চতুর্থ খণ্ডে দেবগণ নামের আশ্রয়ে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। দেবগণ প্রথমতঃ মৃত্যুভয় উত্তীর্ণ হওয়ার ইচ্ছায় বেদ বিদ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্ম করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে অল্প জলে মৎস্যকে দেখার ন্যায় মৃত্যু দেবগণকে দেখিতে পাইয়াছিল। মৃত্যুর এই দেখা, পূর্ব্ব বর্ণিত অসুরগণ কর্ত্তৃক উদ্‌গীথ ভক্তির বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে পাপ বিদ্ধ করার ন্যায়। অর্থাৎ এই সব বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে সকামতা থাকায় ইহাতে মৃত্যুভয় সম্পূর্ণ দূর হইতে পারে না, এই কথা। তখন দেবগণ—
তে নু বিদিত্বোর্দ্ধা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্॥

ছাঃ ১।৪।৩

আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, দেবগণ বৈদিক কর্ম্ম

দ্বারা মৃত্যুভয় অতিক্রমে নিরাশ হইয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অমৃত ও অভয়-গুণসম্পন্ন স্বর-শব্দোক্ত অক্ষরের অর্থাৎ প্রণব ওঁকারের উপাসনায় তৎপর হইয়াছিলেন। এই স্বরে প্রবেশের ফল পরবর্ত্তী মন্ত্রে আছে :—

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতি স্বরতি এব সামৈবং যজুঃ। এষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং, তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্॥ ছাঃ—১।৪।৪

প্রণবরূপী অক্ষর ওঁকারকে অমৃত ও অভয় বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন যে, তাহাতে প্রবেশকরতঃ দেবতারাও অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন।

৩৫। প্রণবরূপী ওঁকারে যুগলমিথুন থাকা এবং মিথুনই অভীষ্ট ফলপ্রদ হওয়ার বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রথম অধ্যায়ে প্রথম খণ্ডে ষষ্ঠ মন্ত্রের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। উক্ত ষষ্ঠ মন্ত্রের সহিত দেবগণের প্রণবরূপী ওঁকার স্বরে প্রবেশ করিয়া অমৃতত্ব লাভের কথা আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে দেবগণ নামাশ্রয়ে ব্রজলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

৩৬। শুধু কি দেবগণের নামাশ্রয়ে অমৃতত্ব লাভ হয় বলিয়া-ই ঋষি অভয়বাণী দিয়াছেন—স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেত দেবাক্ষরস্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি, তৎ প্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি॥ ১।৪।৫

ইহার অর্থ—এখনও যে লোক নামাশ্রয় করে, সেই দেবগণ যেভাবে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেইভাবে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে।

তাই প্রভুবন্ধু গাহিয়াছেন ঃ—

কর্ম্মকাণ্ড পরিহরি, প্রেমে বল হরি হরি,
বন্ধু ভণে হরিনামে পাবিরে বিরাম ।

৩৭। মাণ্ডূক্যোপনিষদে প্রণবের কালাতীত তুরীয় চতুর্থ স্থান শান্ত মঙ্গলময় ও অদ্বৈতরূপ, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অন্যান্য উপনিষদে প্রণবরূপী ওঁকারস্বরাশ্রয়ে জীবের মায়ামুক্ত হওয়ার বিধি আছে। কঠোপনিষদে আছে ঃ—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ ২।১৫
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ২।১৬

শঙ্কর ভাষ্যে আছে—প্রসিদ্ধ এই ওঁকার অক্ষর অপর ও পরব্রহ্মের স্বরূপ। এই অক্ষরকে উপাসনা করিয়া যে যাহা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ কঠ—২।১৭

৩৮। প্রশ্নোপনিষদে পঞ্চম প্রশ্নে প্রসিদ্ধ প্রণব উপাসনার ফল জিজ্ঞাসা করিলে ঋষি বলিয়াছেন ঃ—

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।
তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি॥ ৫।২

এই মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্যে আছে ঃ—বিষ্ণু প্রভৃতির প্রতিমা-

স্থানীয় ওঁকারে যদি ভক্তিযোগে ব্রহ্মভাব স্থাপন করা যায়; তাহা হইলে ধ্যানকারী উপাসকগণের সম্বন্ধে পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম উভয়েই প্রসন্ন হন।

৩৯। তৈত্তিরীয়োপনিষদে শিক্ষাবল্লীতে আছে :—

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্।
ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি
ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি। ১।৮

ইহার অর্থ এই, ওঁ-ই ব্রহ্ম এবং ওঁ-ই সব। ব্রাহ্মণজাতি ওঁ উচ্চারণ করিয়া বেদ বিদ্যা অধিগত হন, এবং তাহার ফলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৪০। ব্রহ্ম হরিদাসের জীবনীতে ভগবদ্ নাম প্রকটরূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নামাশ্রয়ে সংসার ত্যাগ করেন। তাঁহাকে এই নামাশ্রয়চ্যুত করিবার জন্য অমানুষিক অত্যাচার ও প্রলোভন দেখাইয়া লোকে অকৃতকার্য্য হওয়ার পর তিনি শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর সঙ্গ লন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে প্রকট হইলে ঠাকুর হরিদাস তাঁহার আশ্রয়ে গিয়া কিছুকাল বাস করেন। সেই সময়ে হরিদাসঠাকুর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে একযোগে নবদ্বীপে নাম বিলান। তাহাতে তৎকালীন প্রসিদ্ধ দস্যু জগাই মাধাই তাঁহাদের আক্রমণ করে। অহিংসার প্রতিমূর্ত্তি হরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু নাম দিয়া উক্ত দুই দস্যুকে উদ্ধার করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচলে বাস সময়ে হরিদাস ঠাকুর তাহার সন্নিকটে একটি পৃথক কুটীরে বাস করিতেন। হরিদাস

ঠাকুরের শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্মুখে দেহত্যাগ, যাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা একটি অপূর্ব্ব কাহিনী। এই সমস্ত লীলার চিহ্ন এখনও পুরীধামে বিদ্যমান। হরিদাস ঠাকুরের জীবনের একটি ঘটনায় মায়াশক্তিকে কৃষ্ণনাম দিয়া মাধুর্য্য আস্বাদন করানের কথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে। তাহা উল্লেখ করিয়াই এই অধ্যায় শেষ করতঃ গ্রন্থের উপসংহারে আসিব।

হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে গঙ্গার নিকটে গোফায় বাস করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন।

হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়—ওই তার মন॥
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম সংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি—দশদিশা সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না—করে ঝলমল॥
দুয়ারে তুলসী লেপা—পিণ্ডির উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর॥

৩৩২১৬-২১৮

এই রকম অবস্থায় একটি নারী হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিলে তাঁহার অঙ্গ কান্তিতে ঐ স্থান পীতবর্ণ হইল এবং অঙ্গ গন্ধে দশদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। তিনি হরিদাসঠাকুরকে বলিলেন—

জগতের বন্দ্য তুমি রূপগুণবান্।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এখানে প্রয়াণ॥

মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে এই সাধু স্বভাব হয়॥
এত বলি নানাভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্য নাশ॥

৩৩২২৩-২৫

হরিদাস ঠাকুর এই প্রার্থনার উত্তরে বলিলেন:—আমি প্রতিদিন সংখ্যা-নাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে দীক্ষিত আছি। তাহা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কাজ করি না। নাম সমাপ্ত হইলে তোমার প্রীতি আচরণ করিব। এইরূপে নাম করিতে করিতে প্রাতঃকাল হওয়ায় নারী উঠিয়া চলিয়া গেল। এই রকম পর পর তিনদিন চেষ্টা করা সত্ত্বেও—

কৃষ্ণনামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হইল স্ত্রীভাবের প্রকাশ॥
তৃতীয় দিবসের যদি শেষ রাত্রি হইল।
ঠাকুরের তরে নারী কহিতে লাগিল॥
তিনদিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রি দিনে নহে তোমার নাম সমাপন॥
হরিদাসঠাকুর কহে আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব॥
তবে নারী কহে তারে করি নমস্কার।
আমি মায়া করিতে আইলাম পরীক্ষা তোমার॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সভারে মোহিল।
একল তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥

মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণ নাম শ্রবণে॥
চিত্ত মোর শুদ্ধ চাহে কৃষ্ণ নাম লইতে।
কৃষ্ণ নাম উপদেশী কৃপা কর মোতে॥ ৩৩২৩৩-২৪০

এই কাহিনীতে উপনিষদে বর্ণিত নামাশ্রয়ে অজ্ঞানরূপী মায়ার প্রলোভন হইতে মুক্ত হওয়ার কথা রূপ ধারণ করিয়াছে। এই উপাখ্যান শেষ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যদি কাহারও এই ঘটনায় প্রতীতি না হয়, তবে তাহাদের প্রতীতির জন্য বলিতেছি :—

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ প্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণ নাম লয় নাচে প্রেম বন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥
লক্ষ্মী আদি সবে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হইয়া।
নাম প্রেম আস্বাদিল মনুষ্যে জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
অবতরি করে প্রেমরস আস্বাদন॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময়?
সাধু কৃপা না করিলে প্রেম নাহি হয়॥
চৈতন্য গোঁসাই লীলার এইত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাইয়া প্রেমভাব॥
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥ ৩৩২৪৯-২৫৫

উপসংহার

অখণ্ড দর্শন

উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থ শেষ হইল। গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় উপোদ্ঘাতে দিগ্‌দর্শন হইয়াছে। যাহা বলিবার গ্রন্থ মধ্যে বলা হইয়াছে। উপসংহারে আর একবার গ্রন্থে কি বলা হইল তাহা বলিব। ইহাতে দ্বি-ত্রিরুক্তি হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় পাঠক দোষণীয় মনে করিবেন না। "অভ্যাস" দ্বারা বক্তব্য বিষয়ের দৃঢ়তা স্থাপন প্রাচীনদের অনুবর্ত্তিত রীতিও বটে।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-জ্ঞাপক শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি মহাবাণী লইয়া এই গ্রন্থের উপক্রমণিকা। মহাবাণীতে শ্রীকৃষ্ণের তিনটি পরিচয়, সৃষ্টির "অধীশ্বর," বিরাট আদির "ধ্যেয়-বস্তু" ও "নিরুপাধি-মাধুর্য্য-বিগ্রহ।" উপনিষদ দ্বারা এই পরিচয়ত্রয় সিদ্ধান্তিত করিতেই এই গ্রন্থের প্রয়াস।

সংসার বলিতে আমরা সাধারণতঃ পিতা মাতা পতি পত্নী পুত্র কন্যা আত্মীয়স্বজন পরিপূর্ণ পরিবারটি বুঝি। পৃথিবীর সুখ শান্তি বুঝিতে আমরা এই পরিবারবর্গের সুখশান্তিই বুঝি। সংসারে কোটী কোটী পরিবার আছে। ইহারা সকলে একই ছাঁচে তৈয়ারী। সেই ছাঁচ বা ছক (design)টি অনুসন্ধানের বস্তু। ঐ ছকটি নিত্য এবং নির্দ্দোষ। তাহারই অসম্পূর্ণ অনুকরণ (imperfect imitation) অসংখ্যেয় পরিবার। অনুকৃত এই পরিবারগুলিতে যে দোষ সকল আছে, মূল

পরিবারটি তাহা হইতে মুক্ত। এই অনুকৃত পরিবারগুলিতে মুখ্যতঃ তুইটি দোষ—ভালবাসায় স্বার্থবিজড়িত, ভালবাসার পাত্রগুলি মরণধর্ম্মী। নিত্য-পরিবারের ভালবাসায় বিন্দুমাত্র স্বার্থ নাই—তিলমাত্র আত্মসুখ বাঞ্ছা নাই, যার প্রতি ভালবাসা তার সুখানুসন্ধানই একমাত্র কাম্য। নিত্য-পরিবারের ভালবাসায় প্রত্যেকটি পাত্র অজর অমর চিন্ময় বস্তু।

এই নিত্য-পরিবারই ব্রজ-পরিবার। এখানে সখা সখী আছে, মাতা পিতা আছে, প্রণয়িণী প্রেমাস্পদ আছে। কিন্তু কাহারও জন্ম জরা ব্যাধি বা মৃত্যু নাই। জগতের প্রত্যেকটি পরিবার এই ব্রজপরিবারের মত হইবার জন্য চেষ্টা করে। সকলেই ইচ্ছা করে ও চেষ্টা করে যে তাহার স্নেহের পাত্রগুলি জরা মৃত্যু শূন্য হউক ও তাহাদের ভালবাসা সার্থান্ধতা ও কপটতা হীন হউক। প্রত্যেকটি পরিবারই ব্রজের মত হইবার জন্য প্রয়াস পায়। অতএব ব্রজ সকলেরই আদর্শ। প্রত্যেকটি পরিবারকে ব্যষ্টি (unit) ধরিলে, ব্রজ সকল ব্যষ্টি জীবের ধ্যেয়বস্তু। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিয়াছেন—"ব্রজ, ব্রজরাখালগণ, ব্রজ সখীগণ অর্থাৎ ব্রজের যাহা কিছু সম্ভবে তাহা ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। সমস্তই প্রলয়কালে লয় হইবে! দেবতারাও অনিত্য। তাহাদেরও প্রলয়কালে আর সমস্তের মত লয় হইবে; অতএব নিত্য যে ব্রজ সম্বন্ধীয় বস্তু তাহাতেই স্নেহ মমতা, আসক্তি, আশা ও ভরসা করিতে হয়।"

কেবল জীবলোক দেবলোক নহে, বিরাট তুরীয় ব্রহ্ম পরমাত্মা সকল স্বরূপেরই চরম লক্ষ্য ব্রজ-পরিবার। যে যার লক্ষ্য সে

তার ধ্যেয় বস্তু বটে। প্রত্যেক পরিবারেই একটি কেন্দ্রস্থ পুরুষ আছেন। যাহার স্নেহ-প্রীতি পরিবারটি ধরিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক পরিবারকেই ধরিয়া রাখে কাম-মিশ্রিত প্রেম। কিন্তু ব্রজ-পরিবারকে ধরিয়া রাখিয়াছে কামগন্ধহীন উন্নত উজ্জ্বল প্রেম। সংসারের সকল প্রেম তাহারই বিন্দুর বিন্দু-ধনে ধনী হইয়া অগণিত পরিবারবর্গকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছে। ব্রজ-পরিবারের কেন্দ্রস্থ ব্যক্তিটিই কৃষ্ণ। তাঁহার প্রতি প্রীতির পাত্রগণ লইয়াই ব্রজ-পরিবার। এই পরিবারভুক্ত হইবারও উপায় আছে। তাহারই নামান্তর সাধনভজন।

এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যক সৃষ্টি বা সৌর জগৎ আছে। এই অসংখ্য জগতের অগণিত বস্তুজাত নিয়ত পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হইতেছে। এই সকল ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে একটা প্ল্যান আছে। তাহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইতে সম্ভূত। কোনও জড়ের পরিণতি চৈতন্যের সত্তা ছাড়া হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ডের মূল প্ল্যানের রূপায়ন হইতেছে, কৃষ্ণের ইচ্ছার মধ্য দিয়া। আপাত বহু ইচ্ছার মূলে কৃষ্ণের মুখ্য ইচ্ছা একটিমাত্র— সেটি হইল আত্ম আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণের আত্ম আস্বাদনের কামনা হইতে সম্ভূত যে শক্তি-প্রবাহ—এই জগৎ তাহারই পরিণতি। বৃক্ষের একটি শুষ্কপত্রও তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া বিগলিত হয় না। নিয়ত একই ভাবে চলিতে চলিতে বিশ্ব-প্রকৃতি খানিকটা আপাত-স্বাধীনতা অর্জ্জন করে। আমাদের দূরদর্শিতার অভাব বশতঃ আমরা ঐ আপাত স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হই। বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বনিয়ন্তা হইতে

পৃথক করিয়া ভাবি। ভ্রম কাটিলে ইহাই জানা যায় যে, অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টজগতের শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অধীশ্বর।

মায়াশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, বহিরঙ্গা-প্রকৃতি, অপরা-প্রকৃতি—একই বস্তুর এই ভিন্ন ভিন্ন নাম। নিখিল জগৎ এই শক্তিরই প্রকাশ। কৃষ্ণ এই শক্তির অধীশ্বর। জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি, তটস্থা শক্তি, পরা-প্রকৃতি—ইহারাও বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কারণে একই শক্তির বোধক। চেতনা-বিশিষ্ট নিখিল দেবমানবাদি এই শক্তিরই অভিব্যক্তি। কৃষ্ণ এই শক্তির ধ্যেয়বস্তু। স্ব-স্বরূপে স্বীয় অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ নিরুপাধি—নশ্বরতা, পরতন্ত্রতাদি সর্ব্ব-দোষ-শূন্য এবং মাধুর্য্য-বিগ্রহ—আনন্দ শক্তির নির্য্যাস যে মাধুর্য্য, তাহারই ঘনীভূতমূর্ত্তি বা বিগ্রহ।

পরতত্ত্বটি একটি অখণ্ড বস্তু। তিনটি শক্তি একই অখণ্ড স্বরূপের ত্রিবিধ প্রকাশ। অপরা প্রকৃতির যিনি অধীশ্বর, পরাপ্রকৃতির যিনি ধ্যেয়বস্তু, স্বীয় আনন্দ প্রকৃতিতে যিনি মাধুর্য্য বিগ্রহ—সেই অখণ্ড মণ্ডলাকার সচ্চিদানন্দ ঘন বস্তুটি প্রণব। পরাজ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ইহাই ব্রহ্ম গায়ত্রীর "বরেণ্যং ভর্গঃ।" পরে নামাশ্রয়ে পরাভক্তির প্রেমঘন দৃষ্টি লইয়া প্রণবের মধ্যে প্রবেশ করিলে (ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্) জানা যায় প্রণবের "ভর্গঃ"ই শ্রীকৃষ্ণের "ধাম।" ঐ ধামে গেলেই রসতত্ত্বের আস্বাদনে জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়।

ব্রজধামের ভালবাসার পরিবারটিকে দুই ভাগ করা যায়। যাকে ভালবাসে আর যারা ভালবাসে। ভালবাসার বিষয় বা পাত্র একক কৃষ্ণ। ভালবাসে যারা অর্থাৎ যারা ভালবাসার

আশ্রয় তারা আপাততঃ বহু হইলেও তাহাদের মূলাশ্রয় বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা। হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি রাধাকে মহালক্ষ্মী বা "শ্রী" ও বলা হয়। কাজেই শ্রী-কৃষ্ণ এই পদটির মধ্যেই আশ্রয়-বিষয়-ময় যুগল কিশোরের সমগ্র ব্রজলীলার কথা লুকান আছে। প্রণবের অভ্যন্তরে শ্রী-রাধাই কৃষ্ণকে সর্ব্বাতিশায়ী আস্বাদন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণরস আস্বাদন করিতে হইলে যিনি সর্ব্বাধিক আস্বাদন করেন তাহার আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ পন্থা। আনুগত্যে আস্বাদন করিতে করিতে জানা যায়, একই রসতত্ত্ব যুগল হইয়া অনন্তকাল পরস্পরের আস্বাদনে ব্যাকুল। এই আস্বাদন-বহমান স্রোতস্বিনীর মত, স্থির নহে, নিত্য নবায়মান ও বর্দ্ধনশীল। (বিভুরপি কলয়ন্)। একই রসতত্ত্ব 'শ্রী' ও কৃষ্ণরূপে দুই, পুনঃ গৌরসুন্দরে এক। পুনঃ নিতাই গৌরে দুই, শ্রীহরিপুরুষে এক। এইরূপে বৈচিত্র্যময় লীলা নিয়ত চলিতেছে। এই সমগ্র রহস্যটি উপনিষদের সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত হইয়াছে। অতএব "উপনিষদ ও শ্রী-কৃষ্ণ" গ্রন্থের নামকরণ সার্থক।

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম কহিয়াছেন—"সাধু শাস্ত্র, গুরু বাক্য, হৃদয়ে করিয়ে ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা।" সাধুশাস্ত্র—উপনিষদ, গুরুবাক্য—শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর মহাবাণী। দুয়ের ঐক্য যেভাবে এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে অনুভূত হইয়াছে, তাহাই কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় "ভক্তগণে দিনু এই ভেটে"—সাধু সুধী সজ্জন সন্নিধানে ভেট স্বরূপ সমর্পণ করিলাম। এর পরে, "আর না করিহ মনে আশা"—মনে আর কোন আশা নাই। কেবল একটি কথা—

গ্রন্থে যদি কিছু গৌরবের থাকে তাহা যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক তাঁহারই পাওনা, ভুল ত্রুটি যাহা আছে তাহা আমাদের—আমাদের অসংস্কৃত মনের, অযোগ্য বুদ্ধির, অক্ষম দেহযন্ত্রের, অবোধ মুদ্রাযন্ত্রের। এই সকলের জন্য আমরা করপুটে ক্ষমার্থী।

ইহা যাঁহার অযাচিত কৃপার দান
তাঁহারই পাদপদ্মে সমর্পিত
হইল।

শ্রীশ্রীহরিপুরুষায়
সমর্পণমস্তু

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
।/০	৫	সংসারের	সংশয়ের
৷৹	৭	ভাগবতীর	ভাগবতীয়
৷৹	১৬	স্বর্গলক্ষী	স্বর্ণলক্ষ্মী
৪	৮	অধিকারী	অবিকারী
২৮	২	ও স্বরূপই	স্বরূপতঃই
৪৬	১৬	এই দুই শ্লোকই	অবতারের কারণ
৭৬	১৫	নান্যচ্ছ	নান্যচ্ছ্‌
৯৯	৭	বিধি নির্দ্দেশ	বিধি-নিষেধ
১৪৪	৯	বাগিন্দ্রিয়	ত্বগিন্দ্রিয়
১৯৪	৬	প্রকৃত	প্রাকৃত
১০১	শেষ প্যারার প্রারম্ভে—	"অন্নভিক্ষা লীলায় দেখা যায়" —কথাটি বসিবে।	

প্রাপ্তিস্থান—

১। মহাউদ্ধারণ মঠ,

৫৯, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা—১১

২। শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন,

পোঃ শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর